প্রথম অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব : জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ

''কোনো বস্তুরই ইতিবৃত্ত লিখতে গেলে বস্তুটি কি সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে আরম্ভ করতে হয়। উপন্যাস কি বস্তু তা নিয়ে বহু বছর ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আছে। তাত্ত্বিকেরা যে ধারণা তৈরী করে তুলছেন, নতুন ঔপন্যাসিকেরা তা ভেঙে ফেলছেন। নতুন বোধ গড়ে উঠছে, তাও আবার পরিত্যক্ত হচ্ছে। অদলবদল এখনও চলছে, কারণ উপন্যাস সাহিত্যাঙ্গ হিসেবে সবচেয়ে তরুণ, গতিশীল, আগ্রাসী এবং জনপ্রিয়।''[১]

—ড. ক্ষেত্র গুপ্তের এই অভিমতের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলে সাহিত্য শাখার রূপ হিসেবে উপন্যাস যে ক্রম পরিবর্তমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে নিয়ত বদলে যাওয়া জীবনের নানা অভিঘাতই সাহিত্যে বর্ণিত হয় দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব ভাবে। সাধারণতঃ সবদেশের মত বাংলাদেশেও উপন্যাস লেখা হয়েছে গদ্যাকারে; অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। উপন্যাস যখন পুরনো খাত ছেড়ে নতুন নতুন খাতে বইতে বইতে আধুনিক কালের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে তখন বিশেষ লেখকের উপন্যাসের সৃষ্টির অভিনবত্ব, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির মূল্যায়ন করতে গেলে প্রথমেই তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার দিকে অভিনিবেশ করতে হয়। আর তারও আগে বোধহয় সেই রূপটির উৎসস্থলেও কিছুটা আলোকপাত করা জরুরী হয়ে পড়ে। ভাষা ও সমাজ সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা থাকলেও জীবনের নানা দিকের প্রতিফলন ঘটে থাকে সব দেশের সব ভাষার সাহিত্যে—সেই হিসেবে উপন্যাসেও। সেই অর্থে সার্থক বাংলা উপন্যাসের পূর্বসূরী ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমির স্বরূপও উন্মোচিত হয়ে যাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের দ্বারা নির্ণীত উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপের বর্ণনার মধ্যে।

ক. ''The actual term 'novel' has had a variety of meanings and implications at different stages. ... it is a form of story or prose narrative containing characters, action and incident, and perhaps, a plot.''[২]

খ. ''The term 'novel' is now applied to a great variety of writings that have in common only the attribute of being extended works of

fiction written in prose."[৩]

গ. ''গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম; এবং এই সর্বদেশ সাধারণ গল্পের মধ্যেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত ছিল। এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে—গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা সংঘাতে তাহার চরিত্র স্ফুরনের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষন-বিকষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যদিয়ে মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা---ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে।"[৪]

ঘ. ''... শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যানভাগ, চরিত্র চিত্র, পরিবেশ কল্পনা ও বাণীভঙ্গি মিলিয়া সুসম্বদ্ধ একটি শিল্পরূপ মাত্র। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব লেখকের জীবন-দর্শনের উপর নির্ভর করে। যুগে যুগে উপন্যাসের বহির্গতরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যুগ-মানব পিপাসা বিভিন্ন রসসৃষ্টির দাবীও করিতে পারে, নব নব জিজ্ঞাসায় ঔপন্যাসিক জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন। কিন্তু দেখিতে হইবে, তাঁহার জীবন জিজ্ঞাসা (criticism of life) কতখানি গভীর করিয়া, বিস্তৃত করিয়া, সত্য করিয়া জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ নরনারীর ভাগ্যকে পরিস্ফুট করিয়াছে, তাঁহাদের ক্ষণ-প্রাণ জীবনকে চিরন্তণের মহিমা দান করিয়াছে।"[৫]

—এইভাবে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে কোন স্তরের পণ্ডিতদেরই অভিমত হোক না কেন, উপন্যাসে যে একটি কথা বা গল্প-মুখ্যতা থাকে, তা সকলেই স্বীকার করেছেন। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাস অর্থে 'রচা কথা' (দেবী চৌধুরাণী) বুঝেছিলেন। তবে জীবন যেহেতু নদীর মতই নানা খাতে পরিবর্তিত হয়, উপন্যাসও তেমনি নানা দিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ক্রমশই বদলে গেছে। সেখানে কথার বিষয়টি বাহ্যরূপ পরিত্যাগ করে অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। আবার উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনাবলীর চাইতে লেখকের জীবন প্রতীতিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখকের জীবন সম্পর্কিত ভাবনার কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বাহ্যরূপের পরিবর্তন ঘটে গেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন আমরা আধুনিক ভাবধারার ফসল হিসেবে উপন্যাসকে পেয়েছি। তিনি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস সম্পর্কে স্পষ্টতই লিখেছেন— ''এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখানকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজ সজ্জায় অলংকারে তাকে

আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা ক'রে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট । .... সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাঁদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"[৬]

আধুনিক কালের উপন্যাস 'ঘটনা পরম্পরার' পরিবর্তে চরিত্রদের অন্তর্গত বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। বিশেষত্বগত এই বিবর্তনের পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসের উৎস বীজ সন্ধান করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ পাশ্চাত্যের উপন্যাস সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বাংলা উপন্যাস লিখেছিলেন। অথচ বঙ্কিম যদি পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ না করতেন, তাহলেও এদেশের যে নিজস্ব গল্প রচনার ধারা সমান্তরাল ভাবে বইছিল, সেই পথেই বাংলায় উপন্যাস লেখা হত। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিগত সেই ধারার মূলান্বেষণ করা হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে, বিশেষ করে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। এই কাব্যধারার বিশিষ্ট কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে আধুনিক উপন্যাসের বিশেষত্বগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর নানা চড়াই-উৎরাই পূর্ণ জীবনপথ তাঁকে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। এবিষয়ে সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন— ''মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কণে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। ... দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।"[৭]

—আসলে মুকুন্দ চক্রবর্তী কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করতে, অতীত প্রথার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে কিংবা অতিলৌকিকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেননি বলেই তিনি 'খাঁটি ঔপন্যাসিক' হতে পারেননি। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব যে, মুকুন্দের অনেক আগেই আদি-মধ্য যুগের প্রথম কাহিনী কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচয়িতার মধ্যেই এইসব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক এই কাহিনীতে কবি বড়ু চণ্ডীদাস দক্ষ ঔপন্যাসিকের অনেক গণ্ডীই অতিক্রম করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি'র সূচনায় যে 'আঁতের কথা' বের ক'রে দেখানোর দাবী করেছেন তারও পূর্বাভাস এই কাহিনী কাব্যটিতে পাওয়া যায়। পরকীয়া রাধার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কের যে

কৌণিকতা তাতে কৃষ্ণ চরিত্রের পাশাপাশি রাধারও বিবর্তন এবং এমনকী বড়াই চরিত্রটিরও অনেকটাই পরিবর্তিত রূপ লক্ষ্য করি। রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম তা মূলত দেহজ বাসনা প্রভূত হলেও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের তিনটি বিবর্তিত রূপ দেখি। দানখণ্ডে সে 'কৃষ্ণ সতৃষ্ণঃ', নৌকাখণ্ডে 'কামি কৃষ্ণঃ' থেকে 'রাধাবিরহ' অংশে কবি তাঁকে বলেছেন 'গততৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ'। বড়াইকেও কবি একটি 'কুট্টিনী চরিত্র' রূপে শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্নেহপ্রীতি মমতায় পরিপূর্ণ একটি মানবিক চরিত্ররূপে সম্পূর্ণ করেছেন। তবে সবচেয়ে মনস্তত্ত্বসম্মত ভাবে অঙ্কিত চরিত্র রাধা। আইহন পত্নী রাধার বয়ক্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবি তাঁর মানসিক বিকাশটিকেও পূর্ণতা দিয়েছেন। 'তাম্বুল খণ্ডে' যে রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনিই আবার ধীরে ধীরে কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হওয়া থেকে 'বংশী খণ্ডে' গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে প্রেমে আকুল হয়ে উঠেছেন। কবি লিখেছেন—

''কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শব্দদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।''[৮]

এরপর রাধাবিরহ অংশে শ্রীকৃষ্ণ কংস বধের জন্য মথুরায় চলে গেলে রাধার যে বেদনার সুর তা ব্যক্তিগত গণ্ডীকে ভেঙ্গে সবদেশের সবকালের বিরহ বেদনার ধারার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এইভাবে সমকালের বাস্তব জীবন, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন আর কাহিনীর নিটোল বয়নে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস-ই ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেতে পারতেন। নিছক অলৌকিকত্ব আর কালগত-ভাষাগত সীমাবদ্ধতার জন্যই তা হয়ে ওঠেনি। তাঁকে ঔপন্যাসিক মর্যাদা দিতে গিয়ে ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা তাই লিখেছেন— ''ঔপন্যাসিকের দক্ষতায় আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দকে সর্বদা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের চরিত্র সৃষ্টির কথা তখন ভাবি না। ভাবলে দেখবো দোষে গুণে, ভালোয়-মন্দেয়, সার্থকতায়-ব্যর্থতায় রাধাকৃষ্ণের মতোই বড়ায়ি চরিত্র চিত্রণেও কবি আধুনিক ঔপন্যাসিকের পূর্বসূরীত্ব দাবী করতে সক্ষম।''[৯]

১৮০০ খ্রীঃ ৪ঠা মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা গদ্যের বিকাশ শুরু হয়। সেইসময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বকাল পর্যন্ত বাংলায় নকশা জাতীয় বচনা

যেমন রচিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসোপম একাধিক রচনার সন্ধান আমরা পাই। এই ধারার প্রথম বিশিষ্ট রচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাবু উপাখ্যান'। ১৮২১ খ্রীঃ ২৪ শে ফেব্রুয়ারী এটি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই লেখকেরই 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' কিংবা 'কলিকাতা কমলালয়' —এগুলি সবই উনিশ শতকের সূচনালগ্নের কলকাতার বাবু শ্রেণীর জীবনের বিক্ষিপ্ত চিত্রণ। ১৮৫২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় হ্যানা ক্যাথারিণ ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এখানে ফুলমণি আর করুণার জীবনের যে ছবি লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে রচনাটি হয়ে উঠেছে প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের অন্যতম রচনা। চরিত্রসৃষ্টি, পরিবেশ বর্ণনা আর ভাষার সাবলীল প্রয়োগে এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের নানা অসংগতির কারণে তা হয়ে ওঠেনি। এই পর্বের অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) -এর অন্তর্গত দুটি গল্প 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'; লাল বিহারী দে'র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯); কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৮); আর 'বিচিত্র বীর্য' (১৮৬২); মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫৯-৬০); কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা।' (১৮৬১-৬২); গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয় বল্লভ' (১৮৬৩) ইত্যাদি। তবে এই সময়ের সবচেয়ে উপন্যাসের কাছাকাছি রচনা হিসেবে যেটি গ্রহণযোগ্য হবার দাবী রাখে তা হল প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। এতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কলকাতার ও শহরতলীর জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কুশিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবে মানুষের অধঃপতন এবং যথোচিত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ফলে সেই অধঃপতন থেকে মুক্তি—মতিলাল চরিত্রটির বিবর্তনের মধ্যদিয়ে লেখক এটাই তুলে ধরেছেন। রচনাটিকে উপন্যাসের মর্যাদা দিতে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— ''উপন্যাসের আদি সূচনা 'করুণা ও ফুলমণি'তে হইলেও উহার সার্থক পরিণতি সম্ভাবনাময় আরম্ভ 'আলাল'-এ। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে আলালের ঘরের দুলাল'ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণ বিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তব বর্ণনা চরিত্র চিত্রণ ও মনন শীলতা সমস্ত দিকেই পরিস্ফুট। '... আলালের ঘরের দুলাল'ই বোধহয় বঙ্গভাষায় প্রথম সম্পূর্ণবয়ব ও সর্বাঙ্গ সুন্দর উপন্যাস।''[১০] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দাবীর সঙ্গে অনেক সমালোচকই সহমত হতে পারেননি। কেননা পূর্ণাঙ্গ

উপন্যাস হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে রচনাটির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল—

- এর প্লট বা আখ্যানভাগ খাপছাড়া রকমের।
- মূল কাহিনী প্রায়ই অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন হয়ে তার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে।
- অধিকাংশ চরিত্রের ভূমিকাই অপরিণত, অস্ফুট অথবা ক্ষণদৃশ্য। ব্যতিক্রম ঠকচাকা চরিত্রটি।
- নারী চরিত্রগুলি ভূমিকার একেবারেই অবহেলিত হয়ে পড়েছে।
- উপন্যাসে আকাঙ্ক্ষিত প্রণয় রসের স্পর্শমাত্র নেই।
- ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া চরিত্রের পরিবর্তনে সহায়তা করে না।

এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতির উপস্থিতি লক্ষ্য করে সমালোচক ড. সুকুমার সেন মূল্যায়ন করে বলেছেন— ''আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা। বইটির নামেই উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়িয়াছে। যদিও কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতোই তবুও কয়েকটি কারণে বইটিকে রীতিমত উপন্যাস বলা চলে না।''[১১] এইভাবে রচনাটির উপন্যাস কৌলিণ্য খর্ব হলেও এর বাস্তবধর্মী কাহিনী, সরস কৌতুকরস, বাক্‌রীতির চপলতা টাইপ চরিত্র চিত্রণের নিরীখে এটিকে বাংলা উপন্যাসের পূর্বাভাস রূপে গ্রহণ করা যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হলে বাংলা উপন্যাস ভ্রূণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল তার স্বভূমির মৃত্তিকায়। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎই বাংলা উপন্যাসকে ভিন্নমুখী করে তোলেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য রীতির প্রভাবে তিনি বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব স্থায়ী পথনির্মাণ করে দিলেন। সেই পরমক্ষণটি ১৮৬৫ খ্রীঃ। তাঁর আগের বছর আত্মপ্রকাশ করেছে 'Indian field' পত্রিকায় লেখকের 'Rajmohan's wife' (1864)। তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) থেকেই বঙ্কিমের নিজের তথা বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব পথ পরিক্রমা সূচিত হয়েছে। ১৮৬৫-১৮৮৭ দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে বঙ্কিমের ছোট বড় মিলিয়ে উপন্যাসের সংখ্যা চোদ্দটি। উনিশ শতকের নবজাগরণ প্রসূত বাংলাদেশের সমাজ জীবনের অন্যতম প্রাণপুরুষ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এইসব উপন্যাসগুলি লেখেন—তারমধ্যে লেখকের অন্তর্গত সত্তার এক প্রবল দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় অনিবার্যভাবে। এই দ্বন্দ্বের মূলকথা হল নবজাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে যাওয়া — নাকি রক্ষণশীল ভাবনার গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকা। বঙ্কিমের মধ্যে এই

দুইয়ের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেই দ্বন্দ্বকেই বড় ক'রে তুলেছেন। সেইসঙ্গে তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতানুগতির দিকটি বড় হয়ে ওঠেনি কখনোই। 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাসটিকে বাদ দিলে তাঁর বাকী উপন্যাসগুলি বাংলাদেশের পরিচিত পরিমণ্ডলের জীবন নিয়েই রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতেও বাস্তবতার দিকটি বড় হয়ে ওঠেনি। এর পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে শিল্পীর নিরপেক্ষতার পরিবর্তে তাঁর নীতিবাগীশ মনোভাব। প্রসঙ্গত তিনি সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে দুটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন তাঁর উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য করে—

■ ''যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।''[১২]

■ ''টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে।''[১৩]

■ ''যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। ... সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।''[১৪]

নতুনদের প্রতি লেখকের এই নিবেদন থেকেই পরিস্কার যে, তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টির কথা ভাবতেন। নিছক অর্থ-যশ প্রাপ্তি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তিনি মূলতঃ দুটি লক্ষ্য মাত্রা রেখেই সাহিত্য চর্চা করেছেন—

■ সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সমাজের মঙ্গল সাধন। এর অন্যথা হলেই তা পাপে জর্জরিত হবে। ফলে লেখকের যাবতীয় সৃষ্টির বিশেষভাবে উপন্যাস সাহিত্যে এই উদ্দেশ্যমূলকতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর উপন্যাসগুলির গভীরে অবগাহণ করলে দেখা যাবে তিনি এর অন্যথা হতে দেননি। সমাজবাস্তবতা, নরনারীর সম্পর্কের টানাপোড়েন ইত্যাদি একেবারেই গৌণ ব্যাপার ছিল। যতটুকু ছিল তা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। এই ভাবনার সমর্থন পাই ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যেও— ''বঙ্কিমের উপন্যাসে বাস্তব-অনুগতির স্থান কখনোই প্রধান নয়। তাঁহার অঙ্কিত মেয়ে-পুরুষ নিজেদের প্রণয় স্বপ্নে সমাহিত, হৃদয়ারণ্যে তাহাদের বাস, প্রতিদিনকার ঘরকন্নার কাজে তাহাদের দেখা যায় না। তাই হৃদয় দ্বন্দ্বের ও প্রণয় ব্যাকুলতার

বাহিরে যে বৃহৎ কর্ম ও ভাব জীবন পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে তাহাদের দেখা নাই। মাঝে মাঝে যেটুকু গৃহস্থালির বর্ণনা পাই সেটুকু রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মতো অচল ছবি নায়ক-নায়িকার জীবন সংযোগ সেগুলিতে নাই।"[১৫]

—স্বভাবতই বঙ্কিমী ভাবনার এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁর উপন্যাসগুলির উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে বিষয়ের নিরীখে মূলতঃ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিলেন—

■ উপন্যাস ও রোমান্স : উপন্যাসে novel এবং romance বলে যে দুটি প্রধান ভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুটি ভাগ রয়েছে। প্রসঙ্গত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় novel এবং romance এর তুলনা টেনে বলেছেন— ''Novel অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব, ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্র-ধনুরাগ সমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রণ।..। Romance -এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরণের; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে।"[১৬]

—এই পার্থক্য যাই থাক না কেন, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের যেসব উপন্যাসকে রোমান্সের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি হল—

'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)
'কপাল কুণ্ডলা' (১৮৬৬)
'মৃণালিনী' (১৮৬৯)
'যুগলাঙ্গরীয়' (১৮৭৪)
'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)
'রাজসিংহ' (১৮৮১)
'আনন্দমঠ' (১৮৮৪)
'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪)
'সীতারাম' (১৮৮৭)

অবশ্য এই সমস্ত উপন্যাসে রোমান্সের উপাদান সমানভাবে ছিল না। অন্ততঃ 'চন্দ্রেশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'— এই চারটি উপন্যাসে আবার রোমান্সের আতিশয্য

লক্ষ্য করেছিলেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন 'রাজসিংহ'কে। আর 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২), 'রজনী' (১৮৭৭) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) -কে বলেছেন 'সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। বাস্তবিক এই ধরণের মেরুকরণ যথার্থ নয়। কেননা বঙ্কিমের কোন উপন্যাসকে সম্পূর্ণ বাস্তব বা সম্পূর্ণ কল্পনাত্মক বলা সম্ভব নয়। কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটে গেছে বলে রোমান্স রচনাগুলিতে নভেলের বৈশিষ্ট্য এবং বিপরীতটাও পরিলক্ষিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' একমাত্র রোমান্স আর 'রাজসিংহ' একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেণীকরণকে না মেনে উত্তরকালে কোন কোন সমালোচক বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে মূলতঃ চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

সামাজিক ও সাংসারিক উপন্যাস : বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী এবং কৃষ্ণকান্তের উইল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : রাজসিংহ।

ধর্মাত্মক উপন্যাস : আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম।

জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের উপন্যাস : এই শ্রেণীতে আবার আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম -এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই মেরুকরণ থেকেও বোঝা যায় যে এটিও যথাথথ নয়। কেননা এক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনী, যুগলাঙ্গরীয়, চন্দ্রশেখর আর রাধারাণীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার অন্যভাবে দেখলে বলা যায় 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' আর 'সীতারাম' উপন্যাসেও তো ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এ ইতিহাস নেই, এমনটা বলা যাবে না। 'মৃণালিণীতে বাংলাদেশের সাতশ' বছরের সামাজিক ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম বিষয়গত শ্রেণীবিন্যাস যাই করা হোক না কেন—তা পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে না কখনোই। একমাত্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখক নিজেই এবিষয়ে স্পষ্ট করে লিখেছেন— ''... আমি পূর্ব্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"[১৭]

বিষয় ভাবনার ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির শ্রেণীকরণ যাই হোক না কেন এবং সেটা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত সমালোচক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক'রে যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তার নিরীখে বলা যায় উপন্যাসগুলি মূলত ইতিহাসাশ্রিত, ঐতিহাসিক, রোমান্সধর্মী, তত্ত্বমূলক

এবং সামাজিক পারিবারিক দলিল। তবে সে দলিল কতটা বাস্তব জীবন ঘেঁষা আর কতটা আদর্শায়িত তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পাশাপাশি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে উল্লেখ করতে হয় আঙ্গিকগত দিকটির কথাও। এই আঙ্গিক বা গাঠনিক দিকটি নিয়ে পর্যালোচনা করে সমালোচক ড. সুকুমার সেন আবার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—

ক. ''বিবাহের পূর্বে প্রণয় সঞ্চার বা পূর্বরাগ। রূপকথা ছাড়া বঙ্কিম-পূর্ব আখ্যায়িকায় পূর্বরাগ অভাবিত ছিল। ... দুর্গেশনন্দিনীতে পূর্বরাগ আদ্যন্ত জুড়িয়া আছে।... রজনী অন্ধ বালিকা, সুতরাং তাহার পূর্বরাগে দোষ নাই। কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম —এগুলিতে পূর্বরাগ (একতরফা ও দোতরফা) চলিয়াছে বিবাহের পরে।''[১৮]

খ. চন্দ্রশেখর আর রজনী উপন্যাসের নায়িকাদের বাদ দিলে অন্য উপন্যাসগুলিতে নায়িকা চরিত্রের কোনো দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে। এগুলিতে দ্বন্দ্ব মূলতঃ নায়কের। আবার কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, রাজসিংহ উপন্যাসে নায়কেরা দ্বন্দ্ব শূন্য প্রায় ব্যক্তিত্ব মাত্র।

গ. সাধু-সন্ন্যাসীসহ অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দুর্বলতা বরাবরই ছিল। তিনি নিজে বিশ্বাসও করতেন এসব। ফলে তাঁর অনেক উপন্যাসেই (কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, রজনী ইত্যাদি) এইসব মানুষ ও ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই অলৌকিকত্ব বিষয়ে বঙ্কিমের একটি সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তিনি জানিয়েছেন— ''কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত তাহা যেসকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।''[১৯]

ঘ. অধিকাংশ উপন্যাসে দুটি ক'রে সমান্তরাল প্রেম কাহিনী একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ। অবশ্য মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরে কাহিনী দুটিতে সমান্তরাল সামঞ্জস্য নেই। আবার কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং দেবী চৌধুরাণীতে দুটি প্রণয় কাহিনীর পরিবর্তে নায়কের একাধিক পত্নী ও প্রেমাস্পদ আছে।

ঙ. সংসারের সঙ্গে নায়িকাদের যোগ খুবই ক্ষীণ, তাদের অবস্থান মূলতঃ হৃদয় রাজ্যে। আর নায়কেরা ততটাই অবাস্তব নয়। কিন্তু নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্র এতটা অপরিণত যে সেগুলিও ঐতিহাসিক বাস্তবতার বাইরে।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম নির্মাতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনন, কল্পনা, সমাজচেতনা আর সাংবাদিকের সমন্বয় ধর্ম নিয়ে উপন্যাসের যুগোপযোগী মূর্তিটি গড়েছিলেন। উত্তরসূরীর সৃষ্টির ক্ষেত্র কতটা বিস্তার লাভ কিংবা ভিন্নপথগামী হয়েছে, তার যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব হবে বঙ্কিমের গড়া প্রতিমার স্বরূপ নির্ণয়ের পথ ধরেই। বিষয়গত বৈচিত্র্যের নিরীখে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলো মূলতঃ তিন শ্রেণীর— ■ ইতিহাসাশ্রিত ও ঐতিহাসিক, ■ পরিবার ও সমাজ ধর্মকেন্দ্রিক এবং ■ তত্ত্বমূলক উপন্যাস।

মধ্যবর্তী ধারাটিকে বেষ্টন ক'রে আছে প্রান্তের ধারা দুটি। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোকপ্রাপ্ত বঙ্কিম মূলতঃ স্ববিরোধিতার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এর পেছনে ছিল সমকালের শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তের দোলাচলবৃত্তি। সমালোচক ড. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে লিখেছেন— ''উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত কোনো অবস্থাতেই পুরানো অভ্যাস থেকে উন্মুলিত হয়ে পূর্ণ প্রগতিবাদে স্নান করে ওঠেনি। পুরানো শিক্ষা সংস্কারে দৃঢ় প্রোথিত সাবেকি মন নূতন যুগের বাণীকে সীমাবদ্ধভাবে ঠিক যতটা বহন করে চলতে পারে, বঙ্কিমী সাহিত্যে তারই একটা গড়পড়তা হিসাব পাওয়া যাবে।''[২০]

মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল ইতিহাস। গাছ যত দীর্ঘতর হয় তার শিকড়ও তত গভীরে প্রবেশ করে, তাহলেই সেই গাছ শত বিপর্যয়েও দাঁড়িয়ে থাকে মাথা উঁচু করে। একইভাবে একটি জাতির শিকড় হল তার ইতিহাস। বাঙালী জাতির দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিম বুঝেছিলেন বাঙালীর ইতিহাস নেই, তার উজ্জীবনের জন্য দরকার ইতিহাস। সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খলজির বাংলাদেশ দখলের আজগুবি গল্পকে আমাদের ইতিহাস বলে মান্যতা দিতে হয়েছে। এই ইতিহাসের রচয়িতা বাঙালী নয় বলেই এরূপ বিভ্রান্তি। এরকম একটা জাতির জীবনকে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাঁর কমলাকান্ত চক্রবর্তী আফিম খেয়ে জাতির দৈন্যদশা প্রত্যক্ষ করে আক্ষেপ করেছিল। এরকম ইতিহাসাকাঙ্ক্ষী বঙ্কিম স্বভাবতই ইতিহাসের আশ্রয়েই তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) লিখলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোগল পাঠানের যে যুদ্ধ তারই পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি রচিত। এই যুদ্ধের পরিণাম বিচিত্র করতে গিয়ে জগৎ সিংহ তিলোত্তমা-আয়েষা এবং ওসমার-খাঁর প্রেম, পাশাপাশি বিমলা ও বীরেন্দ্র সিংহের অস্ফুট সম্পর্ককে লেখক নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।

'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসে রোমান্স রসের প্রাধান্য থাকলেও এর পটভূমিও মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের শেষাংশ। মোগল হারেমের মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার দ্বন্দ্ব আর নবকুমারের নিষ্ক্রিয় পৌরুষকে কেন্দ্র করে এর রোমান্স রস ঘনীভূত হয়েছে। তুর্কী বিজয়ের গল্পকে নিয়ে লেখা 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। এয়োদশ শতকের প্রারম্ভেই বাংলায় যে তুর্কী আক্রমণ হয়েছিল তারই পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের এই গালগল্পের পাশাপাশি মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের জীবন জটিলতা আর মনোরমা-পশুপতির রহস্যময় দ্বান্দ্বিকতাকে লেখক চিত্রিত করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যুগলাঙ্গরীয়' (১৮৭৪) উপন্যাসটির ঐতিহাসিক পটভূমি তাম্রলিপ্ত। এটিকে অনেকে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স বলেছেন। ইতিহাস এখানে ঘটনা বস্তুতে নিয়ন্ত্রণ করেনি; সামান্য স্পষ্ট করেছে মাত্র। এরপর পলাশী যুদ্ধের অবসানে মীরকাশিম ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসটি লিখেছিলেন বঙ্কিম। এখানে যদিও চন্দ্রশেখর শৈবলিনী-প্রতাপ কেন্দ্রিক মূল কাহিনীটি কাল্পনিক। সেইসঙ্গে মীর কাশিম দলনী বেগম গুরগনআমিয়েটের গল্পও ছদ্ম ঐতিহাসিক। এইসব ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে লেখক অতীত জীবনের গুপ্ত রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে ইতিহাসের সত্যের পাশাপাশি কল্পনাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। এগুলি যে পুরোপুরি ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস নয়, কিংবা তিনি ইতিহাসের মূল সত্য উদ্‌ঘাটন করতেও নামেন নি—সেকথা আমরা বুঝতে পারি যখন তাঁর 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও পার্বত্য রাজা রাজসিংহের চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে বিরোধ ঔরঙ্গজেবের পরাজয় এবং রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পরিণয়—এই ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীকেই উপন্যাসে মূখ্য বিষয় করেছেন। অবশ্য এতেও দুটি ইতিহাসাশ্রিত উপকাহিনী ছিল—ঔরঙ্গজেব-মানিকলাল-নির্মলকুমারী আর জেবউন্নিসা মবারক দরিয়ার গল্প। যুগের আবহকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে লেখক বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা করলেন এখানে। তবে এই জাতীয় উপন্যাসে ইতিহাস ও কল্পনা কোন্‌টা কতটা থাকবে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসকে উপন্যাস এবং ইতিহাস—এই দুই অংশে ভাগ করে তিনি 'রাজসিংহ' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন। আর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক আলোচনার একজায়গায় তিনি লিখলেন— ''ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ

রস সুঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রস টুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন, তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ মাত্র।"[২১]

সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও পরিণতি যেমন থাকে, তেমনি সমকালীন জীবনেরও প্রতিফলন পাঠক প্রত্যাশা করে। এই সমাজ তরঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় কতটা আলোড়ন তুলেছিল তার সুস্পষ্ট পরিমাপ পাওয়া না গেলেও তিনি যে উনিশ শতকের সেই নবজাগরণের কালে প্রগতিশীলতার মানদণ্ডে তাঁর সাবেকী ব্যবস্থার মর্মমূলে আঘাত হানার পক্ষপাতী ছিলেন না, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বরং তিনি পুরনো ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলা যায়। নবীনদের তিনি স্পষ্টতই বলেও ছিলেন সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই লিখতে হবে, অন্য কারণে নয়। মঙ্গল বলতে তিনি বুঝেছিলেন সমাজকল্যাণ। আসলে ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনকে সুচিন্তিত নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই একদিন সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজ বিধিকে স্বীকার করেই সভ্যতার অগ্রগতি—এই বিশ্বাস বঙ্কিমের ছিল। সেজন্য তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' (অনুশীলন) গ্রন্থের এক জায়গায় গুরুর জবানীতে লিখেছেন— ''সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা দণ্ড প্রণেতা ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ও গুপ্ত কোমৎ 'মানবদেবী'র পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।"[২২] আসলে বঙ্কিম মূলত মানুষের হৃদয় রহস্য সন্ধানী কল্পনাপ্রবণ সৌন্দর্য স্রষ্টা হলেও সমাজ সম্পর্কে তাঁর শিল্পী সত্তা অনেকটাই পিছনে পড়ে গিয়েছিল নীতিবাগীশ সত্তার কাছে। তাইতো তিনি বিধবার অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম, কিংবা বিবাহিত পুরুষের অন্য বিধবা নারীর আসক্তিকে ভালো চোখে দেখেননি কখনোই। এর প্রমাণ লেখকের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাস দুটি। এখানে তিনি শুধু বিধবার প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি তাই নয়, সেই বিধবাদের পৃথিবী থেকে

সরিয়ে দিয়েছেন সমাজের মঙ্গলার্থে। তিনি মনে করতেন বিধবার প্রেম কিংবা বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তি সমাজের মাটিতে বিষবৃক্ষের বীজ বপণ করে। এবিষয়ে তিনি তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উনত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ — 'বিষবৃক্ষ কী' -এর এক জায়গায় স্পষ্টই লিখেছেন— ''যে বিষবৃক্ষের বীজ বপণ হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা সকলেরই গৃহ প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। বিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ। ... চিত্ত সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়ন প্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধ বর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায় সেই মরে।''[২৩]

এই ফল খেয়েই বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে মরতে হয়েছে। কিংবা বিধবা নারী হীরাদাসী দেবেন্দ্রতে প্রলুব্ধ হয়ে উন্মাদিনীতে পরিণত হয়েছে। আর কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা রোহিনীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয় সেসময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘ লড়াই শেষে ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবাবিবাহ আইন সম্মত হয়। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে বঙ্কিম ভালো চোখে দেখেননি। বরং তিনি অত্যন্ত কৌশলে তার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র সূর্যমুখীকে দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মুর্খ বলিয়েছেন। সূর্যমুখী একটি চিঠিতে কমলমণিকে লিখেছিল— ''ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?''[২৪]

—এইভাবে কখনো নায়িকাদের সমাজ থেকে চিরতরে সরিয়ে কিংবা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উপসংহারে স্পষ্টতঃই পাঠক বর্গকে উপদেশের ভঙ্গিতে লিখেছেন— ''আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।''[২৫] এ প্রসঙ্গে লেখকের 'সাম্য' গ্রন্থে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। বঙ্কিম এখানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা যেমন বলেছেন তেমনি বিধবার বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বলেছেন— ''...বিধবা বিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি

যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রী শিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কিনা, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর, সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব বিধবাবিবাহ হওয়া কদাচ ভালো নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামিত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।"[২৬] —এই অভিমতের মধ্যে যতটা নারী পুরুষে সমানাধিকারের কথা আছে তার চেয়ে স্ববিরোধী ভাবনাই ব্যক্ত হয়েছে। উপরন্তু তিনি এও বলেছেন 'যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালোবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না।"[২৭] এর মধ্যেও একটা নীতিবোধের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এরই বিষময় পরিণতি আমরা দেখি লেখকের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে। সেখানে বিধবা রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এখানে আমরা দেখি বিধবা রোহিণীর দেহজ কামনা গোবিন্দলাল ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনকে বিনষ্ট করেছে। নগেন্দ্রনাথের মত গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিয়ে করেনি, তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে এবং রিপুর তাড়নায় গোবিন্দলাল দাম্পত্য ধর্মের শুচিতাকে গলাটিপে হত্যা করেছে। অল্পকালের মধ্যেই রোহিণী সম্পর্কে তার মোহ দূর হয়ে গেছে। রোহিণীকে নিষ্ঠুর মৃত্যু দিলেও গোবিন্দলাল তার স্ত্রী ভ্রমরকে আর ফিরে পায়নি। ভ্রমরের হৃদয় যন্ত্রণার অবসান হল মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। আর গোবিন্দলাল সন্ন্যাস জীবনের মধ্যে 'ভ্রমরাধিক' শান্তি পেতে গিয়ে আত্ম-প্রতারণা করল। রোহিণী এই মৃত্যু নিয়ে উত্তরকালে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলে দিলেন সমাজ নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে রোহিণীর মৃত্যুর জন্য কায় দায় ছিল?[২৮]

''রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে। অভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention বেঁচে গেল, সন্দেহ নেই। কি ম'ল, সে আর তার সঙ্গে সত্য সুন্দর আর্ট। ... উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙাণিতে তার মরা চলে না।" —যদিও মোহিতলাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বঙ্কিমচন্দ্রের সপক্ষেই সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে রোহিণী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে ছিলেন। আবার অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও রোহিণীর পরিণতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন— ''যাহারা রোহিণীর অপঘাত মৃত্যু ঘটাইবার জন্য বঙ্কিমকে হৃদয় হীনতার

জন্য অপরাধী করিয়াছেন তাঁহারা রোহিণী সমস্যার কোনো উৎকৃষ্টতার সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন নাই। রোহিনী বাঁচিয়া থাকিলে হীরাদাসীর পর্যায়ে নামিয়া যাইত। তাঁহার মৃত্যু অন্তঃত তাহাকে এই অবনতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। রোহিণীর অপমৃত্যু তাহার কলঙ্কিত ভোগসর্বস্ব প্রেমের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য মৃত্যু হইাতে নীতির কোনো অনুচিত প্রভাব নাই আছে সূক্ষ্মতর বিশ্ববিধানের সহিত সহজ সঙ্গতি।"[২৯] এইভাবে বিতর্ক যাই থাক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা রক্ষণশীল ও নীতিবাগিশ ছিলেন ততখানি শিল্পীর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি।

বঙ্কিমের তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭)—এই তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ী উপন্যাস' (Trilogy) বলা হয়েছে। এই ত্রয়ী উপন্যাসের মূল বক্তব্য হল গীতার অনুশীলন তত্ত্ব ও স্বদেশ ভাবনা। এই তত্ত্ব ভাবনা প্রসঙ্গে ড. অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন— ''... চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার ফলেই পরিণামে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) স্বদেশ ধর্মের বিমূর্ত তত্ত্বে উপস্থিত হন। তত্ত্ব যখন শুধুমাত্রই তত্ত্ব, তখন তাহার মূল্য নিতান্তই কম। কিন্তু তত্ত্ব যখন ব্যবহারিক সত্যের মর্যাদা লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ সার্থকতা, তাহার যথার্থ উপযোগিতা।'[৩০]

—বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্বদেশ প্রীতির পরিচয় আমরা পাই 'ধর্মতত্ত্ব -এর চতুর্বিংশ অধ্যায়ে। এখানে তিনি তাঁর ভাবনাকে ব্যক্ত করে জানিয়েছেন—

সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। ... সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম ধ্বংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস।'[৩১] স্বভাবতই তিনি অনুশীলন আর স্বদেশ প্রীতির পথে জাতির মুক্তি অন্বেষণ করেছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে, 'মৃণালিনী'র স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস এতে কাব্যরসসিক্ত সংহতি লাভ করেছে। দেশের প্রতি অপার অগাধ ভালোবাসা জনিত ভাবাবেশে তিনি স্বদেশ মাতৃকাকে কালিকা মূর্তির সঙ্গে উপমিত করেছেন। মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন এবং মা যা হবেন। এই অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তিনটি কালের নিরীখে তিনি 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করেছিলেন। এতে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা সমস্ত চরিত্রকে এক সমুন্নত ভাব কল্পনার সুসংগতির ঐক্যসূত্রে গেঁথেছে, বাস্তব ও কল্পিত আদর্শের মধ্যে সমস্ত বিরোধ মুছে গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—ইতিহাসের এই

বাতাবরণের মধ্যে উপস্থাপিত উপন্যাসের কাহিনীটি লেখকের ভাবনা প্রসূত। এককথায় এতে লেখক জগজ্জননীর যে বন্দনা করেছেন তা ভারতীয় শাস্ত্রের মূলমন্ত্র 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' -এরই অনুসারী। ফলে এই উপন্যাস মন্বন্তরের দলিল যতটা তার চেয়ে বেশী লেখকের জীবন দর্শনের বাণী প্রচারের এক অভিনব প্রয়াস।

'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসটিও সেদিক থেকে 'আনন্দমঠ' -এর পরিশিষ্টের মত। বাংলাদেশে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কালের এক বিশেষ সময়ের ফসল এই দুটি উপন্যাস। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বের প্রথমদিকের ঘটনা রূপ পেয়েছে 'আনন্দমঠ' -এ আর শেষের দিকে ঘটনা রয়েছে 'দেবী চৌধুরাণী'তে। দুটিরই পটভূমিতে আমরা পাই উত্তরবঙ্গকে। দেশে তখন চরম অরাজকতা চলছে। সেই মাৎস্যন্যায় কালে দাঁড়িয়ে গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব ও কল্যাণময়ী পরিবারনিষ্ঠ জীবনাদর্শ গ্রহণ করে বাংলাদেশের সাধারণ গৃহবধূ প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হয়েছিল। স্বামী ব্রজেশ্বরের নীরব উপস্থিতি আর শ্বশুর বাড়ীর লোকজনদের ক্রর ভূমিকায় প্রফুল্লকে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে উত্তরবঙ্গের তখনকার রবীন হুড ভবানী পাঠকের সান্নিধ্যে দুর্ধর্ষ নারী ডাকাত দেবী চৌধুরাণী করেছে। বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেবী রাণীর সংগ্রাম শেষে এক আদর্শ গৃহী নারী হিসেবে শ্বশুর গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। মাঝে প্রফুল্ল যোগ সাধনা করেছে—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ—এগুলি তাকে যথার্থ মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত করেছে। এইভাবে পর্বতের মুষিক প্রসবের মত প্রফুল্লর কাহিনীতে কিছু কিছু অসংগতি সহজেই চোখে পড়ে। প্রফুল্ল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির শিক্ষা নিয়ে আদর্শ নারীতে পরিণত হল — তা পরিণামে কেবল গৃহ জীবনেই পূর্ণতা পেল—একজন আদর্শ গৃহিণী হওয়ার জন্য এত কাল এত রকম সাধনার প্রয়োজন ছিল না। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত ঘটনার ঘনঘটায় এটি সাধারণ রোমাঞ্চ রচনায় পর্যবসিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবশ্য এখানে লেখকের শিল্প দক্ষতার বেশ পরিচয় রয়েছে। এবিষয়ে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন— ''কাহিনীর পরিকল্পনায় ও বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প দক্ষতা বেশ পরিস্ফুট আছে 'দেবী চৌধুরাণী'তে আরম্ভ অত্যন্ত অভিনব। পাত্রপাত্রীর কোনরূপ পরিচয় না দিয়া, স্থানকালের কিছুমাত্র উদ্দেশ না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে সদরে না বসাইয়া একেবারে অন্তরে প্রবেশ করাইয়াছেন। ... ঘর সংসারের চিত্র যেটুকু আছে তাহা যথা সম্ভব বাস্তব ও মনোহর।''[৩২]

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। এই জীবন নিয়ে কী করব, কী করতে হয়—এরই উত্তর সন্ধানে তিনি জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। এহেন শিল্পীর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' এ এসে আমরা দেখতে পাই তিনি যেন ধর্মতত্ত্ব প্রচারের পথ পরিত্যাগ করে কিছুটা জীবন শিল্পীর প্রমাণ রাখলেন। সামন্ত রাজ্যের অধিপতি সীতারাম কেমন করে আদর্শচ্যুত হয়ে পতনের দিকে ধাবিত হলেন সেটাই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। আসলে গীতার তত্ত্বের বাঁধ দিয়ে মানুষের কল্লোলিত প্রকৃতিকে রোধ করা যায় না। কেননা মানব জীবন নিয়ে নিয়তির খেলা যেমন রহস্যময় তেমনি নিষ্ঠুর। মানুষের ভাগ্য চিরকাল পুঞ্জীভূত অন্ধকারের প্রস্তর কঠিন প্রাকারে প্রতিহত হয়েছে। তার সামনে কোনো আলো নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই। এখানেও তাই দেখা যায় নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, সীতারাম ও শ্রী'র পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের চিত্র, সংসার এবং সন্ন্যাসের সংঘাত। স্বামীর অমঙ্গল আশংকায় সহধর্মিণী স্বামীকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। পরমবাঞ্ছিতা নারীকে হারিয়ে সীতারাম অতৃপ্ত পিপাসা সঞ্জাত উন্মত্ত আচরণ করে নিজের বিনষ্টি আর রাজ্যের অধঃপতন ঘটালেন। ছদ্ম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই কাহিনীটি উপস্থাপিত করে লেখক 'ত্রয়ী উপন্যাসের বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করেছেন। এই ত্রয়ীর মূল্যায়ণ করে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন—''...বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্পরূপ কিছু নতুন চেষ্টা সত্ত্বেও আনন্দমঠে এবং সম্পূর্ণত দেবী চৌধুরাণীতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সীতারাম তাকে ভেদ করে সবেগে এবং পূর্ণ দীপ্তিতে মুক্তি লাভ করেছে।''[৩৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের গতিধারা যখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল সেই সময় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সাহিত্যে নতুন করে গতিসঞ্চার করে তাকে নতুন পথে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আসলে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্পর্শে পাষাণী অহল্যার মত বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ ঘুমের অবসান ঘটে যায়। বাংলা উপন্যাস নব কলেবরে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এবিষয়ে সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন— ''বঙ্কিমচন্দ্রের পরে উপন্যাসে যে গভীরতর বাস্তবতা পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার প্রথম সূচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্বজ্ঞান বলে বঙ্কিম প্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে

ফিরাইয়া আনিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কাজে লাগাইয়াছেন।"[৩৪] —এই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ কবি। তাঁর কিশোর কবি মনকে প্রথম যিনি প্রভাবিত করেছিলেন তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী—বাংলা কবিতার 'ভোরের পাখি'—তাঁকে রবীন্দ্রনাথ গুরুপদে বরণ করেছিলেন সেই কিশোর বয়সে। কেননা বিহারীলালের কাব্যের গভীর আবেগ, তীব্র রোমান্স আর সুদূর সঞ্চরণের অভিলাষ রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিল। এরপর মধুসূদন দত্তের ক্লাসিক কাব্যের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি আরও বেশী রসাস্বাদন করেছেন এবং আপন সৃষ্টি ধারায় তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি তরুণ কবিকে উপন্যাস রচনায় বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা রশ্মি। রবীন্দ্রনাথ যখন বিহারীলাল-মধুসূদনে মাতোয়ারা, সেইসময় আবেগপ্রবণ কিশোরটির হাতে এসেছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। ১৮৭২ খ্রীঃ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র হৃদয়ও লুঠ করে নিল। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন— ''এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলার সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র। ইংরাজি ভাষায় যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন।"[৩৫] এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই বঙ্কিম উপন্যাসের জগতে প্রবেশ নিশ্চিত হয়েছিল। তাঁর চেতনার পরিস্ফুরণের সাথে সাথে তিনি দেখেছেন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ইত্যাদি স্বর্ণ সম্পদ। তবে এইসব সম্পদ ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশীকাল আবদ্ধ থাকলেন না। অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন পরবর্তী বাংলা কথাশিল্পের দিক নির্দেশক। বাস্তবিক উপন্যাসের একদিকে যেমন থাকে জীবনের জটিলতা, অন্যদিকে তেমনি আত্মপ্রকাশ করে সচেতন মন। জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সামগ্রিকতাবোধ নির্ভর করে তাঁর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধ্যান ও ধারণার উপর। এই জীবন আবার নিয়ত রূপান্তর প্রবণ। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও বিরোধও পরিবর্তনশীল। তাই প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ সভ্যতার বৃহৎদায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে তার রূপায়ণও ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ব্যক্তি মানুষ সমাজ পরিবেশের আঘাতে যে যন্ত্রণা অনুভব করছে, যে যন্ত্রণা তার অস্তিত্বের যন্ত্রণা — তা নিঃসন্দেহে উপন্যাসের বিষয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বোধ, চেতনার বিস্তার এবং গভীরতা উপন্যাসের প্রতিটি অংশেই অভিব্যক্তি লাভ করে। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সঞ্চার করেছেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস এক নতুন শিল্প চেতনা যার ফলে 'রিয়ালিটি' সম্পর্কে

আমাদের ধারণা বদলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধারায় (১৮৬১-১৯৪১) প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কালের ব্যবধানে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১৩টি উপন্যাস লিখেছেন। আর 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' কে ধরলে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ১৪টি। এগুলির মধ্যে কিশোর বয়সে লেখা 'করুণা'কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে উপন্যাসের তালিকাভুক্ত করতে সংকোচ বোধ করেছেন। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে আলাদা করে বের হয়নি। এর কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'জীবন স্মৃতি'র পাতায় জানিয়েছেন— ''যে বয়সে ভারতীতে লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না।''[৩৬] এই উপন্যাসে করুণা নাম্মী একটি কিশোরীর জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। রোমান্টিক গীতি কবিতার ভাবাবেগে কবির হৃদয় তখন পরিপূর্ণ ছিল। অন্তরের আবেগ-অনুভূতিকে কবি বাস্তবের শক্ত মাটির উপর দাঁড় করাতে পারেননি। জীবন এখানে আকস্মিকতার সূত্রে গ্রথিত। করুণার পিতার আশ্রিত দরিদ্র নরেন্দ্র ঘটনাস্রোতে করুণার স্বামী। ভোগপরায়ণ স্বার্থান্ধ দুষ্ক্রিয়াসক্ত নরেন্দ্রর আচার-আচরণের প্রতিবাদ করতে পারেনি করুণা। আত্মরক্ষায় অসমর্থ করুণাকে শেষে মর্ম-যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তবে এতে রয়েছে করুণা ছাড়াও আরও দুটি নারী চরিত্র-মোহিনী ও রজনী। মোহিণীর বৈধব্য জীবনের যে সংকট উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক তাতে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির সামর্থ্যের প্রথম আভাস আমরা পাই। সেইসঙ্গে এখানে তিনি রজনী - মহেন্দ্র- মোহিনীর ত্রিকোণ প্রেমের বৃত্ত অংকনের চেষ্টা করেছেন। ফলে কাঁচা হাতের এই লেখার ভেতরেই পরবর্তীকালে লেখা 'চোখের বালি'র পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেন প্রসঙ্গত লিখেছেন— ''...করুণা অপরিণত রচনা হইলেও ঐতিহাসিক মূল্য বর্জিত নয়। মোহিনী-মহেন্দ্রর অপ্রধান কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইলের ছায়া এবং চোখের বালির পূর্বাভাস আছে। করুণার মহেন্দ্র ও রজনী পরে চোখের বালির মহেন্দ্র আশাতে পরিণত।''[৩৭]

নিতান্ত কিশোর বয়সের অপরিণত প্রয়াস আর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের ছায়ারেখা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে বিষয় ভাবনার নিরীখে বিভাজন ক'রে সেগুলির ওপর আলোকপাত করা যায়।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস : 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)।

জীবন সমস্যা মূলক উপন্যাস : 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯)।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ভাবনার ফসল : 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)।

রোমান্টিক ও তত্ত্বমূলক উপন্যাস : 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্মিত পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ২২ বছর বয়সে লিখলেন ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। করুণাকে বাদ দিলে এটি তাঁর প্রথম যথার্থ উপন্যাস। এতে বাংলাদেশের বারো ভুঁইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ইতোপূর্বে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক তথা কেরী সাহেবের মুন্সী রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। সাইত্রিশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই উপন্যাসের মূল কাহিনী ইতিহাস থেকে নেওয়া। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির 'সূচনা' অংশে লিখেছেন— ''স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তার ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।''[৩৮]

—স্বভাবতই এই উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আদর্শ পরায়ণ নায়করূপে চিত্রিত না করে এক উদ্ধত অবিনয়ী কুটিল রাজনীতিজ্ঞ চরিত্র হিসেবে অংকন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতাপের কুটিল রাজনীতির বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিক সহজ মানবধর্মকে দাঁড় করিয়েছেন। রাজনীতির চক্রব্যূহে পড়ে মানসিক প্রেমের ব্যর্থতা বিভা-উদয়াদিত্যের কাহিনীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত্, এখানে আদর্শবাদের প্রতীক বিবিধ মানবিক গুণে তাঁর চরিত্র ঋদ্ধ। প্রতাপাদিত্যকে মহৎ চরিত্র হিসেবে অংকন না করে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক সত্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরন করেছেন। এবিষয়ে ওই সূচনাতেই তিনি আরও লিখেছেন— ''অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে

ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।”[৩৯]

—এইভাবে ইতিহাসের কংকালকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাতে সঞ্চার করেছেন যথার্থ মানবধর্মকে। যেকারণে প্রতাপাদিত্যের পরিবর্তে বসন্ত রায় আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভাবনা ও জীবনাদর্শের প্রতিরূপ। সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত চরিত্রটি সম্পর্কে তাই যথার্থই লিখেছেন—‘‘বসন্ত রায়ের চলা পৃথিবীর মাটি থেকে কিছু উপরে, স্নেহের ভাবালু উচ্ছ্বাসে সংসারের সঙ্গে তার বন্ধন। মাটির পৃথিবীতে দুর্লভ হলেও আলো সুর দিয়ে গড়া, ধুলো দিয়ে নয়, এমন মানুষ বসন্ত রায়। তাকে অলীক বলে অস্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না।”[৪০]

ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে লেখা ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের ‘স্বপ্ন লব্ধ উপন্যাস’। এর ভিত্তিমূলে ছিল দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ—জন স্টুয়ার্টের ‘বাংলার ইতিহাস’ এবং কৈলাসচন্দ্র সিংহের ‘রাজমালা’। সেই সঙ্গে দেওঘর থেকে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করে ট্রেনে ফেরার সময় লেখক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় স্বপ্নে যা দেখেছিলেন সে বিষয়ে উপন্যাসটির ‘সূচনা’য় লিখেছেন—‘‘স্বপ্নে দেখলুম একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বারবার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা, এত রক্ত কেন? বাপ কোনোমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল।”[৪১] রাজা গোবিন্দ মানিক্য ও নক্ষত্র রায়ের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব মন্দিরে বলিদানকে কেন্দ্র করে। এবং এই দ্বন্দ্বে রাজপুরোহিত রঘুপতির দম্ভ ও আচার নিষ্ঠা উপন্যাসে জটিলতা ও গতি সঞ্চার করেছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কিংবা রাজ্য লোভের চেয়ে প্রাণের সহজ প্রীতি ও ভ্রাতৃপ্রেম যে অনেক মহার্ঘ তা উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। অবশ্য মূল দ্বন্দ্ব প্রেম ও প্রতাপের। গোবিন্দ মানিক্য প্রেম এবং রঘুপতি প্রতাপের প্রতিভূ হিসেবে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছেন। শেষপর্যন্ত পালিত পুত্র জয়সিংহের অকল প্রয়াণে প্রেমের কাছে প্রতাপের পরাভব ঘটেছে—রঘুপতি সংস্কার মুক্ত হয়ে প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরবর্তী কালে এই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘বিসর্জন’ (১৮৯০) নাটকটি। উপন্যাসটির মূল্যায়ন করে সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—‘‘...রাজর্ষিতেও ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য বৈচিত্র্য ও কোলাহল

লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; ইতিহাসের রঙ্গভূমি যেন দুইটি আত্মার দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্যই পরিস্কৃত করা হইয়াছে। মোগল সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার রাজধানী—এ সমস্তই যেন কবির আধ্যাত্মিক ধ্যান-নিরত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অস্পষ্ট, ছায়াময় ভোজবাজির মত চলিয়া গিয়াছে।"[৪২]

—এই পর্যন্ত উপন্যাস রচনা ধারায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ঔপন্যাসিক প্রতিভার আলো খুব বেশী প্রকট ছিল না। তবে তিনি যে ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে—তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

উপন্যাসে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বকথার বৃত্ত ভেঙ্গে জীবন সমস্যার গভীরে অবগাহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল সময় নিয়েছিলেন। রাজর্ষি থেকে 'চোখের বালি' (১৮৮৭-১৯০৩) এই দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে তিনি কোনো উপন্যাস লিখলেন না। এই সময় তিনি নিজের মত করে উপন্যাস লেখার জন্য প্রস্তুতি পর্ব রাখলেন। অন্তর্বর্তীকালীন এই সময়টুকুতে তিনি অসংখ্য ছোটোগল্প লিখেছেন। যেন অনেকটা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার জন্য সলতে পাকানো। মাঝের সময়কালগুলোতে তিনি এই ছোটোগল্প লেখা প্রসঙ্গে 'চোখের বালি' উপন্যাসের 'সূচনা' অংশেই লিখেছেন—''....এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটোগল্পের উল্কা বৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনো হয়, তবে কীনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্ততঃ গল্পের এলাকার মধ্যে।"[৪৩] এই উল্কা বৃষ্টি কালেই ১৯০১ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়েছিল 'নষ্টনীড়' গল্পটি। এটি একটি তরতাজা প্রেমের গল্প। বড়লোকের ছেলে ভূপতি তার তরুণী স্ত্রী চারুলতাকে নিয়ে সুখে-দুঃখে ঘর সংসার করছিল। এইসময় বাড়ীতে আসে ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল। চারুর সঙ্গে অমলের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এর কারণ ছিল ভূপতি যখন তার খবরের কাগজ বের করার কাজে ডুবে ছিল, তখন মাঝখান দিয়ে অনেকটা সময় বয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন—''যে সময়ে স্বামী-স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চির নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণ প্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন অভ্যস্ত হইয়া গেল।"[৪৪] তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙ্গনের গল্পই হল নষ্টনীড়। শেষ

পর্যন্ত অমল চলে গেলেও চারু ভূপতির নীড় নষ্ট হয়েছে। এই নীড় নষ্টেরই এক ভিন্নতর প্রকাশ লেখকের 'চোখের বালি'তে (১৯০৩) আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে দীর্ঘ ১৬ বছরের ব্যবধান কেন প্রয়োজন ছিল না জানি না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উপন্যাসের সূচনায় একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন নিজের মত করে। তিনি লিখেছেন—''আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ।"[৪৫] রবীন্দ্রনাথের এই কথা থেকে পরিস্কার যে, এখান থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাসের শুধু নয়, বাংলা উপন্যাসেরও একটা নতুন পথ পরিক্রমার সূচনা। ইতিপূর্বে বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, এখানে এসে তার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। এখান থেকেই বাংলা উপন্যাস যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের এই আধুনিকতার শীর্ষভূমিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যে দিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

■ সমকালীন সমাজ পরিবেশে যে আধুনিকতার ধারাপাত ঘটছে সেই রূপটিকে উপন্যাসের পটভূমিতে গ্রহণ করা।

■ চড়াই-উৎরাই শূন্য নিস্তরঙ্গ দ্বন্দ্ব জটিলতাহীন সহজ সরল চিত্রের পরিবর্তে নানা সমস্যা কন্টকিত জটিল রূপকে উপন্যাসের কাহিনীতে উপস্থাপন।

■ নিছক ঘটনা পরম্পরা নয়, মানব চরিত্রের অন্তর্গত প্রবৃত্তি প্রবণতাগুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা।

■ আধ্যাত্মিক ভাব কল্পনা ও অলৌকিকতার পরিবর্তে যুক্তিবাদী ভাবনা, সন্দেহবাদ ঈশ্বরে বিশ্বাস না-বিশ্বাসের সনাতন পথ পরিহার করে মানুষকে মানুষের স্বরূপে তুলে ধরা।

■ নরনারীর গতানুগতিক সম্পর্কের কৌণিকতা ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলির মূল্যায়ন থাকা দরকার।

■ গতানুগতিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে ব্যক্তি মানুষ নিজেকে তুলে ধরবে—তাতে সমাজ ধর্মের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হবে জেনেও।

■ বিষয়ের পাশাপাশি প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রেও নতুন দিক বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিতে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন। এইসব আধুনিক ভাবনার বৃত্ত

গড়ে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'কে বাংলা উপন্যাসের পথে একটা মাইল ফলক করে প্রতিষ্ঠা দিলেন। উপন্যাসটির ওই 'সূচনা' অংশের একেবারে শেষে তিনি নিজেও ঘোষণা করেন—''সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নায়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।"[৪৬]

নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় উপন্যাসটি 'বিনোদিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন 'চোখের বালি'। বাল বিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এর কাহিনীতে আশা মহেন্দ্রকে, মহেন্দ্র বিনোদিনীকে, বিনোদিনী বিহারীকে আর বিহারী আশাকে ভালোবাসে। ফলে এক জটিলতাময় চমৎকার প্রণয়বৃত্ত রচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিনোদিনীর কাশী যাত্রার মধ্যদিয়ে উপন্যাসে বাঞ্ছিত শান্তি ফিরে এসেছে। অবশ্য বিনোদিনীর এই পরিণামকে নিয়ে নানাভাবে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করেছিলেন কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। তিনি দেখিয়েছেন উপন্যাসটির দুটি পরিণতি হতে পারত—মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর মিলনে মহেন্দ্রর পারিবারিক বিপর্যয় কিংবা বিহারী-বিনোদিনীর বিবাহ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহস করে এগিয়ে গেলেও ভয়ে পিছিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই পরিণতির জন্য নিন্দার দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছেন। আসলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর পরিণাম নিয়ে মনে মনে অনুতাপ করলেও তিনি শিল্পীর নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু বিধবা বিবাহ পছন্দ করতেন না তাই তাঁর জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীর বিয়ে দেননি। এই ধরণের দুর্বল সমালোচনার জবাবে ড. সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন—''... পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন এই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি গল্পের 'স্বাভাবিক' পরিণতি ঘটিতে দেন নাই—এমন কল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিটিকে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহার শিল্প অনুধাবণেও তাঁহাদের মনোযোগ নাই।"[৪৭]

উপন্যাস হিসেবে 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) তরল রোমান্স আশ্রয়ী। রমেশ নামে এক যুবক নৌকাডুবির পর কোনরকমে রক্ষা পায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে, তার কাছে কমলা নামে এক অপরিচিতা নববধূ যে সদ্য বিবাহিতা এবং বিয়ের রাতে স্বামীকে দেখেনি—সেও

পড়ে আছে। কমলা রমেশকেই স্বামী মনে করে এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। কিন্তু রমেশ জানত কমলা তার স্ত্রী নয় এবং সে হেমনলিনী নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কমলার স্বামী হল নলিনাক্ষ। শেষপর্যন্ত নানা ঘটনার টানাপোড়েনের পর কমলা ও নলিনাক্ষের পুনর্মিলন ঘটে আর রমেশ হেমনলিনীর জীবন ট্রাজেডির অন্ধকারেই ডুবে থাকে। এই জাতীয় পরিণতি অত্যন্ত আজগুবি। এই উপন্যাস মহাকবির হাতের দুর্বল সৃষ্টি। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন—''উঁচু শিল্পকর্ম রূপে এ রচনা গ্রাহ্য হতে পারে না। নায়ক চরিত্রটি বিবর্ণ। যে সমস্যার সামনে সে পড়েছে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার বা তার দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হবার মত ব্যক্তিত্ব রমেশের নয়। .... মাঝে বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শ অনুভব করা গেলেও উপন্যাস হিসেবে এ গ্রন্থের স্থান খুব উচ্চে নয়।''[৪৮] 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'তিন পুরুষ' নামে যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল পরে তার নামকরণ করেন 'যোগাযোগ'। সমকালে জলধর সেন 'তিন পুরুষ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন আর এটি শেষপর্যন্ত তিনটি প্রজন্মের গল্প নয় বলে এরূপ নাম পরিবর্তন। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। হঠাৎ ধনাগমে স্ফীত শিক্ষা সংস্কৃতি বর্জিত মধুসূদন আর মার্জিত আভিজাত্যে বর্ধিত পড়তি ঘরের মেয়ে কুমুদিনী বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হল। কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের শিক্ষা-সংস্কৃতি রুচি ও আভিজাত্য বোধ মধুসূদনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে কুমুদিনীকে ভরসা যুগিয়েছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কুমুদিনী যখন জানতে পারল সে 'মা' হতে চলেছে—তখন আর সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেনি। এই দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মূল্যায়ন করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—''চরিত্র বিশ্লেষণের দিক দিয়া মধুসূদন কুমুদিনীর চরিত্র বৈপরীত্য ও তাহাদের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।... বহির্জগতের মত অন্তর্জগতের সংঘর্ষের যদি কোনো বাহ্য লক্ষণ থাকিত তাহা হইলে মধুসূদন কুমুদিনীর মিলন মুহূর্তে ধূমকেতু পুচ্ছপৃষ্ঠ সৌর জগতের ন্যায় একটা প্রলয়কারী অগ্ন্যুৎপাত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।''[৪৯]

বিংশ শতকের সূচনা লগ্নে আসমুদ্র হিমাচল সারাদেশে যে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের যে প্রবল ক্ষোভ ও গণ জাগরণ দেখা দিয়েছিল—সেই উত্তাল সময়ে দাঁড়িয়ে সংবেদনশীল ও সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তার বাইরে রাখতে পারেন নি। দেশের সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছেন

'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) -এর মতো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাসে ধর্মান্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায়।

'গোরা' উপন্যাসের মধ্যে সমাকালীন যুগ জীবনের এক দ্বন্দ্বময়তা এবং তা থেকে উত্তরণের এক সামগ্রিক পরিমণ্ডলের দ্যোতনা রয়েছে। আয়তনে ও অন্তরধর্মে এটি মহাকাব্যোচিত উপন্যাস। এর সামাজিক পটভূমিকার দিগ্‌দর্শন হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন, সেইসঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রাদুর্ভাব আর ভিন্নমুখী আন্দোলনের সঙ্গে যুগপৎ জাতীয়তার উন্মেষ ও নানা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁর বিকাশের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, হিন্দু পুনরুত্থানবাদ, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, ইংরেজ স্তব-স্তুতি ইত্যাদি সমকালীন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ভাব-তরঙ্গ 'গোরা'কে মহাকাব্যের বিশালতা দিয়েছে। গোরা ও সুচরিতার প্রেম সম্পর্কটি সমুন্নত মহিমা ও গাম্ভীর্যে দীপ্যমাণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বহু ঘটনা, বহুচরিত্র, বহু তর্ক-বিতর্ক উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসবের মধ্যেও উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রটি নিপুণতার সঙ্গে বজায় রাখতে পেরেছেন। গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারান, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী—প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরেশবাবুর শান্ত প্রসন্নতা, আনন্দময়ীর আদর্শবাদ উপন্যাসটিকে বিশেষ গৌরবের আসন দিয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক গোরা সনাতন হিন্দু-ধর্মের আদর্শ রক্ষায় তৎপর এবং ইরেজদের বিরুদ্ধেও সে সংগ্রামে দৃঢ় সংকল্প। তার মধ্যে ভারতীয় জীবনবোধের আদর্শ যখন একেবারে গভীরভাবে প্রোথিত সেই সময় গোরা জানতে পারে, সে আসলে আইরিশ সন্তান। তখন গোরার সব বন্ধন ঘুঁচে যায়—তার আর কোনো জাত থাকে না, সংস্কার থাকে না, সংকীর্ণ ধর্মমত থাকে না—সে হয়ে ওঠে বিশ্বমানবতার প্রতীক। পালনকর্ত্রী আনন্দময়ীর মধ্যে সে দেখতে পায় সত্যিকারের ভারতবর্ষকে—আনন্দময়ী যেন এক জ্যোতির্ময় কল্যাণ প্রতিমা। দেশপ্রেম ও বিশ্বচেতনার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে গোরা হয়ে ওঠে ত্যাগ আর যুগ-যুগান্তরের সাধনার প্রতীক। সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন—''গোরার যাত্রা শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের দেবতার সন্ধানে—গোরাকে আমরা ভালবাসি বলে একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ ব্যাখ্যা দিতেই পারেন যে, সে দেবতা মানুষের মধ্যেই।

কেননা পরেশবাবুর কোনো সমাজে স্থান নেই একথার মানে হচ্ছে, সকল দেবালয়ের দ্বারা যখন বন্ধ, তখন মানুষের মাঝেই তাকে সন্ধান করতে হবে।"[৫০]

১৯০৫ খ্রীঃ লর্ড কার্জন-কৃত বঙ্গভঙ্গের প্রয়াসের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ বাংলাদেশব্যাপী প্রবাহিত হয়েছিল—সেই পটভূমিকায় ঘর ও বাইরের সম্পর্কের নিরীখে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। এখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে 'স্বদেশী' আদর্শে নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করে আন্দোলনে নেমেছিলেন এবং কবিতা, গান রচনা, রাখীবন্ধন উৎসব ইত্যাদির মধ্যদিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আন্দোলনকারী নেতৃত্বের সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ-ভাবনা এবং হিংসার বিরোধিতা করে তিনি আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন একরকম। এই বর্হিমুখী এবং অন্তর্মুখী সংকট নিয়ে লেখা উপন্যাসটি। এই আন্দোলনের বৃত্ত একদিকে স্বামী নিখিলেশ অন্যদিকে স্বামীর বন্ধু সন্দীপ—এই দুয়ের মধ্যে 'শ্রেয়' ও 'প্রেয়ের' দ্বন্দ্বে বিমলা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত স্বামীর কাছে সে অশ্রুজলে স্নাত হয়ে ফিরে এসেছে। নিখিলেশ আদর্শবাদী উদার ও নরমপন্থায় আস্থাশীল, অন্যদিকে সন্দীপ চরমপন্থার উগ্র সমর্থক শুধু নয়—মেকী দেশপ্রেমিকের আড়ালে সে হীণমনা, অর্থলোভী এবং বিমলার দেহের প্রতি তার প্রবলতর আকর্ষণ। শেষপর্যন্ত সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার মোহভঙ্গ হয়েছে। সন্দীপের বৃত্ত ভেঙ্গে বিমলা স্বামীর কাছে ফিরে এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে নরমপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে নিখিলেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। সে তুলনায় সন্দীপকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন—''সন্দীপের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনুকম্পায়ী নন বরং অনেকটাই বিরূপ। অথচ এই চরিত্রের মুখ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আধুনিকতার কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিয়েছেন। হয়তো দেখাতে চেয়েছেন উচ্চৈঃস্বরে যা নিজেকে আধুনিক বলে প্রমাণ করতে চায়, তা যদি সত্যের বিরুদ্ধে হয় তাহলে তা যথার্থ আধুনিক হতে পারে না।"[৫১] আসলে প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্ণ নয়। এই তথাকথিত আধুনিকতার প্রতিনিধি হিসেবে সন্দীপ চরিত্রকে অংকন করে রবীন্দ্রনাথ সেই আধুনিকতার মিথ্যা আড়ম্বরকে ব্যঙ্গ করে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। আর নিছক তত্ত্ব এই উপন্যাসে নিরাশ্রয় নয় তত্ত্ব মানুষের জীবন সমস্যার অংশ বিশেষ। তত্ত্ব আধুনিক

কোনো মানুষের কাছে বহিরঙ্গ খোলস নয়, সে সেই মানুষের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের আবরণে 'ঘর' ও 'বাইরে'র মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে তিনি উপন্যাসটিকে একটা বিশেষ মাত্রা দিয়েছেন।

আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের কবলে নরনারীর জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তারই মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসটি। অতীন্দ্র ও এলার ব্যর্থতার কাহিনী নিয়ে মাত্র চারটি অধ্যায়ে উপন্যাসটি রচিত। এই উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—''স্বভাবের এবং স্ব-ধর্মের প্রতিকূল আচরণের মধ্যে গ্লানি ও দুঃখের বীজ নিহিত থাকে, স্ব-ধর্মের পীড়নে মানুষের গভীরতর চিত্ত পীড়িত হয়, ট্রাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে, এই অর্থেই উপাধ্যায় মহাশয়ের পতন বোধগোচর এবং তাহারই ইঙ্গিত 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে।''[৫২]

অতীন্দ্র ও এলা তথাকথিত দেশসেবার দেউলে নিজেদের মানবধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বড় আঘাত নেমে এল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিবাদটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহনীয় মনে হয়েছে। তবে উপন্যাসটি প্রকাশের পরেই এর সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হলে রবীন্দ্রনাথ তার জবাব দিতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপটে অতীন্দ্র ও এলার প্রেমের কাহিনী বলেছেন।

রোমান্টিক ভাবনার পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের নিরীখে মানব জীবনের অতলে প্রবেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—যার ফসল 'চতুরঙ্গ' (১৯১৫), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুইবোন' (১৯৩৩) এবং 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রথমে চারটি ছোটগল্পের আকারে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি বেরিয়েছিল। 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' এবং 'শ্রীবিলাস'—এই স্বতন্ত্র গল্প চারটিকে লেখক পরে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি কাহিনীর আকার দিয়েছেন। নায়ক শচীশের আত্মোপলব্ধির সত্যপথ সাংকেতিকতার মধ্যদিয়ে উপন্যাসে বিধৃত। শচীশ-দামিনীর বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের আভাস ইঙ্গিত মনোবিজ্ঞানের উর্ধ্বে এক অপরূপ চেতনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, জযাঠামশাইয়ের শিষ্য নব্য মানবতাবাদী 'পজিটিভিস্ট' শচীশ লীলানন্দ স্বামীর কাছে রসের দীক্ষা নিয়ে রূপ-জগতে অরূপ সাধনায় ব্যাপৃত হল। অন্যদিকে দামিনী রূপ জগতের

অধিবাসিনী, ইন্দ্রিয়ময় জগতের মধ্যে সে শচীশকে কামনা করে। ফলে রূপ ও অরূপ, বস্তু ও রসের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে গেল। শচীশের সেই অরূপ এষণা আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন---''চেতন মনের অন্তরালে যে রসধারা বহমান, আমাদের দেশের আউল-বাউল-সহজিয়া সাধকেরা যে রসের রসিক, শচীশের মতো মানবতত্ত্বে বিশ্বাসী আধুনিক যুবকও লীলানন্দ স্বামীর কাছে সেই রসের দীক্ষা নিয়ে রূপ জগৎকে অরূপ জগতের অঙ্গীভুত করে নিল। অপরদিকে দামিনী শচীশকে রূপচেতনা ও পার্থিব সত্তার মধ্যদিয়ে কামনা করে। এই বিচিত্র মনোদ্বন্দ্ব আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ও অপরূপ রহস্যময় ব্যঞ্জনার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে।"[৫৩] —বস্তুত এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন যুক্তিই শেষ কথা নয়। তাই নায়ক শচীশ, প্রথমে ছিল 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাসী, পরে 'ঈশ্বরে বিশ্বাসী'—কিন্তু কোথাও সে স্থায়ী হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আত্মমুক্তির পথে বেরিয়ে সে বলল 'আমি কবি'। এইভাবে যুক্তি, বাস্তবতা, এসব তথাকথিত পথ বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ শচীশকে নিয়ে গেছেন এক ভিন্নতর লোকে।

রোমান্সের রাজহংস রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে পৌঁছে রোমান্টিকতার কাঞ্চনজঙ্ঘায় উপনীত হয়েছেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে। জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন নতুন রামগিরি, নতুন অলকাপুরীর সৌন্দর্য মাঝে। প্রচুর কাব্যগুণ, কাবিযক সংলাপ, কবিতার আবৃত্তি এবং শেষপর্যন্ত একটি দীর্ঘ কবিতা উপন্যাসটির প্রাণ। শিলং পাহাড়ের মায়াময় পরিবেশে অমিতের লঙ্গে লাবণ্যর দেখা, পরস্পরের অনুরাগী হওয়া, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের জলের লবণাক্ত আস্বাদ ছেড়ে ঘড়ার জলে তৃষ্ণা মেটায় অমিত রায়। বিয়ে করে কেতকী মিত্রকে। আর লাবণ্য শোভনলালকে বিয়ে করে সংসার-জীবন পথ চলতে থাকে। যে অমিত লাবণ্যকে ঘিরে একদিন ডানা মেলে পেয়েছিল ওড়ার আকাশ, আজ ছোট্টবাসা পেয়ে ডানা গুটিয়ে বসেছে। আপাতমস্তক রোমান্টিক এই উপন্যাস পড়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণ তুর্কীর দল হতচকিত হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ভঙ্গিমা ও বাক্‌বৈদগ্ধ্য দেখে। উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—''শেষের কবিতা সমন্বয় সুষমা ও কবিত্ব মণ্ডিত বিশ্লেষণ শক্তির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি করিতে পারে। বিষয়ের ঐক্য ও আলোচনার সমগ্রতায় অবান্তর বস্তুর প্রায় সম্পূর্ণ বর্জনে ইহা অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।"[৫৪]

রবীন্দ্র সৃষ্টি ধারার নারীকে আমরা মূলতঃ দুইরূপে পাই—প্রিয়া এবং জননী। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'দুইবোন' উপন্যাসটির শুরুতেই 'শর্মিলা' অংশে জানিয়েছেন—''মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

একজন জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ... আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র।"[৫৫] মূলতঃ এই তত্ত্ব 'দুইবোন' এবং 'মালঞ্চ' উপন্যাসের উপজীব্য। 'চতুরঙ্গ'-এর মতই চারটি চরিত্রের বক্তব্য নিয়ে 'দুইবোন'-এর কাহিনী রচিত। এরা হল—শর্মিলা, নীরা, ঊর্মিমালা আর শশাঙ্ক। আপাতদৃষ্টিতে চতুর্ভুজ থাকলেও এই উপন্যাস আসলে ত্রিভূজ প্রেমের, শর্মিলা-ঊর্মিমালা আর শশাঙ্ক কেন্দ্রিক। নিঃসন্তান শর্মিলার সমস্ত চিন্তা ছিল স্বামী শশাঙ্ককে ঘিরে। শশাঙ্ককে সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করার ভার সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। পরিচিত কক্ষপথে শর্মিলার অসুস্থতার পথ ধরে সংসারে আসে তার বোন ঊর্মিমালা। পারিবারিক হাস্য-পরিহাস, সম্পর্কের ছদ্মবেশে শশাঙ্ক আর ঊর্মিমালার মধ্যে গড়ে উঠেছে গোপন প্রণয়। প্রথমে কেউ আঁচ না পেলেও পরে শর্মিলা টের পেয়েছে এবং শশাঙ্ক ঊর্মিমালা নিজেরা অবহিত হয়েছে সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে। অন্যদিকে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা, সরলা আর আদিত্যের সম্পর্কের মধ্যদিয়ে নারী-পুরুষের টানাপোড়েনকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই উপন্যাস দুটির আলোচনা প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন—''রবীন্দ্রনাথের কোনো দুটি উপন্যাসে এত মিল নেই। এর সঙ্গে তুলনা চলে বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইলের। বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের আপাতদৃষ্টিতে একই ধরনের অবস্থা ও সমস্যা, কিন্তু মানুষগুলি স্বতন্ত্র হওয়ায় সমস্যার রঙ-রূপ বদলে যায়, লেখকের সেই খোঁজ একই ধরনের দুটি বই লেখার ভিত্তিতে কাজ করে থাকবে।"[৫৬] রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে যা কিছুই লিখে থাকুন না কেন, তাঁর ভিন্ন পরিচয় খুব বেশী প্রয়োজন পড়ে না—তিনি মূলতঃ কবি, কাব্যিক ভাবরসেই তাঁর আত্মার মুক্তি ঘটেছে। যথার্থ উপন্যাস রচয়িতার যে ধরনের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার দিকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ সচরাচর সে পথে হাঁটেননি। ফলে তাঁর অনেক উপন্যাসেই বাস্তব চিত্রগুলি কল্পনার রংয়ে রঙীন হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসে একটি অনিবার্যভাবে উচ্চারিত নাম

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)। বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতির ব্যক্তিত্ববাদের চরম পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্র সাহিত্য। ব্যক্তির সম্মোহনের মাত্রাকে তিনি চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কথা মনে রেখেও বলা যায়, শরৎচন্দ্রই প্রথম বাঙালী পাঠকের মনের মণিকোঠায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। তিনি প্রথম দেখিয়েছেন উপন্যাস শুধু গল্প বলা নয়, তার চেয়ে অনেক কিছু বেশী। উপন্যাস জীবনের কথা বলে, জীবনের নানা টানাপোড়েন জ্বালা-যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে। জীবন-যন্ত্রণার অভিঘাতে জর্জরিত মানুষের কাছে উপন্যাস মানে শুধু ড্রয়িংরুমে বসে পড়া কোনো জমজমাট গল্প নয়। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র নিছক কলাকৈবল্যবাদী নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্যকে যদি সমাজের একেবারে নীচু তলায় পৌঁছে না দেওয়া যায়, তাহলে তা কখনোই সর্বজনীনতা পেতে পারেন না। সারা পৃথিবীতে যখন বিজ্ঞানের হাত ধরে মধ্যযুগীয় সব পুরনো ধ্যান-ধারণা বর্জন করে সার্বিক উন্নয়ণের দিকে এগিয়ে চলেছে তখনো এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ নানা জপতপ, মন্ত্রতন্ত্র, পুরাণের নানা অলৌকিক কাহিনী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাদের জীবনপথ পাড়ি দিচ্ছে। সেই আলো-আঁধারি সময়ে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দরদী মন নিয়ে নির্মম বাস্তব কাহিনী তুলে এনে মানুষের বদ্ধমূল ধারণাকে ভাঙ্গতে সচেষ্ট হয়েছেন। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন জীর্ণ—সেইসব কিছুকে ভেঙ্গে তিনি নতুন করে ভারতীয় জীবনধারায় আধুনিকতার মুক্ত বাতাস বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি নিজেই স্পষ্ট করে বলেছিলেন—''সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।''[৫৭] এই বক্তব্যের মধ্যেই সমাজের নীচুতলার মানুষদের জন্য শরৎচন্দ্রের দরদ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সমাজ ব্যবস্থার পট পরিবর্তনেরও একটা সুর শোনা যায়। এহেন শিল্পীর উপন্যাসগুলিকে বিষয়ের নিরীখে শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে সমালোচকরা বিভিন্ন কৌণিকতার সৃষ্টি করেছেন। 'বড়দিদি' (১৯১৩) থেকে 'নববিধান' (১৯৩৮) তাঁর উপন্যাসগুলিকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন—

- প্রেম বর্জিত পারিবারিক বিরোধচিত্র ।
- সমাজবিধির প্রাধান্য চিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধ কাহিনী।
- সমাজ সমালোচনা মূলক উপন্যাস।
- পুর্বরাগ পুষ্ট মধুরান্তিক প্রেম।
- নিষিদ্ধ সমাজ বিরোধী প্রেম।
- মতবাদ প্রধান ও পূর্বানুবৃত্তিমূলক উপন্যাস।

—অন্যদিকে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (পঞ্চম খণ্ড)-এ চারটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন—

- প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিম অনুপ্রাণিত উপন্যাস—'পরিণীতা' (১৯১৪), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬)—এগুলিতে বঙ্কিমের উপন্যাসের রস ও কালের অনুরণন শোনা যায়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র-প্রভাবিত উপন্যাস—'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)।
- তৃতীয় পর্যায়ে আত্মকথাশ্রিত উপন্যাস—'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭, চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩)।
- চতুর্থ পর্যায়কে ড. সেন নাম দিয়েছেন 'দিক্‌ভ্রান্ত'। এখানে 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) উপন্যাসটির কথা বলা যায়।

অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে বিষয়-ধর্মের গতি-প্রকৃতি অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—

- পরিবার জীবন
- প্রণয় ধর্ম
- সমাজ প্রেক্ষিত
- সমাজতত্ত্ব।

লেখকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এবং রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'—এই

মেরুকরণের বাইরে থাকে।

সমালোচকদের পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা শরৎ উপন্যাসগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

- পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক ।
- সমাজ সমালোচনা মূলক।
- রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানমূলক।
- তত্ত্বাশ্রয়ী ও রাজনৈতিক মতবাদমূলক।
- আত্মজীবনীমূলক।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসেই বাঙালী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবারের মানুষগুলির নানা দোলাচলবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত শরৎচন্দ্র ছিলেন বাঙালী পারিবারিক জীবনের রূপকার। বাংলাদশের হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং ধনী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার ফসল পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাসগুলি। প্রসঙ্গত লেখকের মানসিকতার মূল সুরটি ব্যক্ত হয়েছে অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায়। তিনি লিখেছেন—''বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো মননশীল পাঠকের চেয়ে সাধারণ পাঠককুলের কাছে পৌঁছানোই শরৎচন্দ্রের অধিকতর পছন্দ ছিল। কাজেই এই শ্রেণীর পাঠকের মর্মমূলে সহজে আলোড়ন তোলার জন্যই পারিবারিক জীবনের 'ডিটেলে'র উপর তিনি কাজ করতে চেয়েছেন।''[৫৮] লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে একান্তবর্তী পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাঁর 'নিষ্কৃতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল' 'শুভদা', 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে এই ভাঙ্গনের চিত্র আমরা পাই। 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসে দেখি, নিজেদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত দুই আইনজীবী ভাইয়ের সংসারে বৃত্তিহীন খুড়তুতো ভাই রমেশের জায়গা হল না। সেইসঙ্গে পরিবারের মধ্যে বহুমুখী নারীর ভাবনা আর চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েনকেও তুলে ধরেছেন লেখক নয়নতারা শৈলজার মত নারীর মধ্যদিয়ে। 'বিন্দুর ছেলে'তে আবার অর্থনৈতিক বৈষম্যের পথে নয় দুই ভাইয়ের পৃথক হয়ে যাওয়ায় মূলে ছিল জমিদার কন্যা বিন্দুবাসিনীর সাময়িক উত্তেজনা। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে জমিদারী অর্থের অহংবোধকে ব্যক্ত করেছে। আর এরই ফলে মাধব ও যাদবের পৃথক হওয়া এবং পেটের

দায়ে যাদবের চাকরীর সন্ধানে প্রৌঢ় বয়সে পথে নেমে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শেষে মান-অভিমান প্রশমিত হলেও একান্তবর্তী পরিবার হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। 'রামের সুমতি' কিংবা 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ ভাইদের পৃথক হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরের লোকের ভূমিকা ছিল। 'রামের সুমতি'তে নারায়ণীর নিজের মা আর 'বৈকণ্ঠের উইল'-এ মনোরমার বাবা এই বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছিল। শরৎচন্দ্রের পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্প হিসেবে প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস হিসেবে 'বিরাজবৌ', 'পণ্ডিতমশাই', 'অরক্ষণীয়া' এবং 'শুভদা' কে চিহ্নিত করা যায়। 'বিরাজবৌ' উপন্যাসটিকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ গল্প' হিসেবে উল্লেখ করলেও ড. ক্ষেত্র গুপ্ত এটিকে 'সতীত্ব-অসতীত্ব : এক দুর্ভাবনা' শীর্ষক শিরোনামে আলোচনার সূচনাতেই স্পষ্টই লিখেছেন—''বিরাজবৌ একটি অতি দুর্বল উপন্যাস। গল্পের কোন আকর্ষণী শক্তি নেই। ঘটনা বিন্যাসে হেতুবাদের একান্ত অভাব। উপন্যাস ব্যক্তি মানুষের কাহিনী, তাদের হৃদয়ের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে। সর্বজনীন যুক্তি সেখানে না চললেও ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিরও একটা নিজস্ব যুক্তিবাদ আছে। সেটা লেখককেও মেনে চলতে হয়। বর্তমান উপন্যাসে তার বালাই নেই বললেই চলে।"[৫৯]

এই উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতই চিরাচরিত পথেই দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনকে অংকন করেছেন। নীলাম্বর ও বিরাজের আদর্শ ও ঐকান্তিক দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনা দিয়ে বঙ্কিমের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনের অক্ষমতার ফলে মনোবেদনা থেকেই বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে নীলাম্বর স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহ করেছে। এই পথেই উপন্যাসের শেষে ট্রাজেডির রস ঘনীভূত হয়েছে। উপন্যাসটি সম্পর্কে ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন—'' 'শুভদা' ও বিরাজবৌ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক ভারতের হিন্দু আদর্শের সতী স্ত্রীর চরিত্র এঁকেছেন, যে স্ত্রী সর্বসময়ে ও সর্ব অবস্থায় স্বামীর অনুগামী।"[৬০] শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রধানতঃ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। সেই গ্রামকেন্দ্রিক জীবনের এক অনবদ্য দলিল 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটি। এতে পূর্বে বিবাহিতা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণের পাশাপাশি গ্রামসমাজের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এর কাহিনীতে দেখা যায় বৃন্দাবন কুসুমকে প্রথমে বিবাহ করলে, পরে কুসুমকে তাড়িয়ে দিয়ে বৃন্দাবন পুনর্বিবাহ করে। কুসুমের আশ্রয় হয় কুঞ্জ ফেরিওয়ালা। বৃন্দাবনের মা কুসুমকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে চাইলেও আত্মাভিমানী কুসুম রাজী হয়নি। এদিকে বৃন্দাবনও ভাঙ্গে তবু মচকায় নি। কুসুমের

অভাব তীব্র হলে সে যখন বৈরাগী হতে চেয়েছে, তখন কুসুমও তার সঙ্গে বৈরাগিনী হতে চেয়েছে। এখানে কাহিনীটি বাস্তবতাকে অতিক্রম করে আদর্শলোকের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই মতের সমর্থন পাই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেও—''... শেষের দৃশ্যগুলিতে বৃন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটিও বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শের উর্ধ্বলোকে উঠিয়া গিয়াছে—যে নীতি প্রাধান্য শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের কোনো কোনো উপন্যাসের ত্রুটি বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাই তাঁহার নিজের উপন্যাসকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।''[৬১]

ছোটগল্প না উপন্যাস—এই বিতর্কে ড. সুকুমার সেন 'অরক্ষণীয়া'কে উপন্যাসই বলেছেন। এতে একটি পারিবারিক ছবি, তার মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতির প্রশ্ন ঢুকে এটিকে সামাজিক কাহিনী নির্ভর উপন্যাস করে তুলেছে। উপন্যাসটির আলোচনায় ড. ক্ষেত্র গুপ্ত দেখিয়েছেন, এখানে লেখকের দরদীমন যতটা সক্রিয়, শিল্পী মানসিকতা ততটা নয়। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন— ''শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত লেখা তাঁর দরদী মনের এবং সামাজিক পারিবারিক বাস্তবতা বোধের নিদর্শন, অবাধ কারুণ্য সৃষ্টিতে এক সময়ে পাঠকের মন অশ্রুসজল করে দখল করে বসত তার মধ্যে অরক্ষণীয়া।''[৬২] উপন্যাসটির নায়িকা জ্ঞানদা। অর্থকৌলিন্য ও রূপ এই দুইয়ের অভাবে বিবাহযোগ্যা মেয়েরা যখন সমাজের চোখে বিয়ের বয়স অতিক্রম করে যায়, তখন ঘরে বাইরে ঐসব মেয়েদের জীবনে যে মানসিক পীড়ন চলে তারই অনিবার্যতা এতে পরিলক্ষিত হয়। স্বামীহারা বিধবার সংসারযাত্রা নির্বাহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট একদিকে দুর্গামণির দৃষ্টান্তে পরিদৃশ্যমান, আর একদিকে এক অনূঢ়া মেয়ের সংসারাশ্রমের দ্বারপ্রান্তে অনুপ্রবেশের জন্য অসহায় অনুমতি প্রার্থনার রূপ জ্ঞানদার বৃত্তান্তে প্রতিফলিত হয়েছে।

পারিবারিক জীবন প্রবাহেরই একটি বিশেষ পর্যায় দাম্পত্য বিরোধ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য সূত্রেই এই বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার পরিনাম চিত্রিত হয়ে থাকে। এরকমই দাম্পত্য সংঘাতের বিশিষ্ট উপন্যাস 'গৃহদাহ' (১৯২০)। এতে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের প্রাথমিক দ্বন্দ্বের পথ ধরে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে তৃতীয় পুরুষের উপস্থিতিতে ট্রাজেডি ঘণীভূত হয়েছিল। মহিম-অচলার দাম্পত্য জীবনে সুরেশের অনুপ্রবেশে দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। 'ঘরে বাইরে'র বিমলার মত অচলা স্বামী নাকি স্বামীর বন্ধু সুরেশ—এই দু'জনের মধ্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। বিমলা শেষপর্যন্ত স্বামীর কাছে ফিরে এলেও অচলার

জীবন ট্রাজেডির অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। এর মূল্যায়ন ক'রে সমালোচক ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন— ''...অচলার জীবনে ছিল একটা মূলীভূত অসঙ্গতি। সুরেশের ভালোবাসা ছিল তাহার বিড়ম্বনা, তাহার সম্পদ, তাহার সম্বল। ইহাতে অগৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে মিথ্যার ফাঁকি নাই। নারী হৃদয়ের এই যে বিরোধ ও অসঙ্গতি ইহার বিশ্লেষণেই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব।''[৬৩] দাম্পত্য জটিলতার আর এক নবতর সংযোজন 'নববিধান' (১৯২৪) উপন্যাসটি। এখানে দুই বিপরীত কালচারের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। পাশ্চাত্য জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত শৈলেশের সঙ্গে প্রাচীন পন্থী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের মেয়ে উষার বিবাহ হয়। উভয়ের অনৈক্যের জন্য শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। শৈলেশের দ্বিতীয় বার বিবাহ, স্ত্রীর মৃত্যু এবং পুনর্বিবাহের আলোচনাকালে শৈলেশ তার প্রথমা স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসে। উপন্যাসটির মূল্যায়ন করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— ''...এই ক্ষুদ্র কাহিনীটির মধ্যে কোনো গভীর জীবনসত্য, মানব চরিত্রের কোন স্মরণীয় বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। শৈলেশের দুর্বল প্রথানুগত্য ও আচরণের দুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যে দোলায়িত অস্থিরতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।''[৬৪]

শরৎচন্দ্র ছিলেন যতটা শিল্পী, ততোটাই সমাজ সংস্কারক। মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ এই সমাজ সংস্কারকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন— ''... আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি তখনকার দিনে সমাজ বিপ্লবের ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, সমাজ বিপ্লবের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে লড়েছেন।''[৬৫] মূলত তিনটি উপন্যাসে লেখকের এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) এবং 'দেনাপাওনা' (১৯২৩)। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য 'দেনাপাওনা'র পরিবর্তে 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৫) -র কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্র শুধুই সমাজ শক্তির কেন্দ্র বিন্দুটিকে স্পষ্ট করেননি, এর পোষণ ও সমর্থনের স্বার্থ দুষ্ট অংশটিরও উন্মোচন করেছেন। তিনটি উপন্যাসেই তিনি সামাজিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হয়েছেন। 'পল্লীসমাজ'-এ লেখক প্রথমে তিনটি দিককে তুলে ধরেছিলেন— পল্লীবাংলার দুরবস্থা, গ্রাম সংস্কার আর সমাজপতিদের কীর্তিকলাপ। পরে এরসঙ্গে রমা-রমেশের প্রেমকে যুক্ত করেছেন। সমাজপতি বেণী ঘোষালদের যাবতীয় অপকীর্তি, গ্রামীণ মানুষের চরিত্র, জাতপাত, শিক্ষা দারিদ্র এসব লেখক খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেইসঙ্গে বিধবা রমা ও রমেশের প্রেম, আর রমেশের হাত ধরে গ্রাম সমাজের উত্তরণ দেখিয়েছেন। এই উত্তরণের ভিন্নতর চিত্র পাই

‘বামুনের মেয়ে’ উপন্যাসে। উপন্যাসের জমিদার চরিত্র গোলক চাটুয্যে প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে পারেনি বলে কীভাবে সন্ধ্যার বিয়ের আসরে সেই তথ্য ফাঁস করে একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এরই পাশে অরুণের সংগ্রামের দিকটি অনুজ্জ্বল রেখে অসহায় মানুষের দুঃখগ্লানি ও পুঞ্জীভূত বেদনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক। ‘দেনাপাওনা’ উপন্যাসে দেখা যায় অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী কেমনভাবে প্রাক্তন স্ত্রী ষোড়শী তথা অলকার সংস্পর্শে আমূল বদলে গেছে সেটাই দেখিয়েছেন লেখক। জীবানন্দের ন্যায় শোষক অত্যাচারী জমিদার, কুচক্রী শয়তান নায়েব এক কড়ি নন্দী, সহযোগী ধনী জোতদার জনার্দন রায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সর্বেশ্বর শিরোমণি ও তারাদাস চক্রবর্তী—আর একদিকে আছে দরিদ্র, দুঃস্থ, নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ। চণ্ডীর ভৈরবীকে নিয়েই এই উপন্যাস। এখানে ধর্মের মোহ বড় কথা না, তার থেকে বড় মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে স্বার্থপর লোকেদের ঘৃণ্য চক্রান্ত। আর এখানেই উপন্যাসটি সামাজিক আবেদন সমৃদ্ধ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন—‘‘...‘অরক্ষণীয়া’, ‘বামুনের মেয়ে’ ও ‘পল্লীসমাজ’—এই তিনটি উপন্যাসে সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে যে সামান্য রকমের প্রণয়চিত্র আছে, সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের অবতারনা করা হইয়াছে।’’[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘মানসী’ কাব্যের ‘নিষ্ফল কামনা’ কবিতাটির শেষে লিখেছিলেন—

‘ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল
নিবাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।’[৬৭]

এই প্রেম মধ্যবিত্তের কাছে প্রকৃষ্ট ভাব বিলাসের উপাদান। যা অনির্বাচনীয়, যা দুরধিগম্য, যা বিমূর্ত তার প্রতি মধ্যবিত্তের অন্তরের টান অত্যন্ত প্রবল। প্রেমের অনতিস্পষ্ট চেহারাটিকে ঘিরেই মধ্যবিত্তের রোমান্টিক কল্পনার পরিমান সর্বাধিক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই প্রেমের

মূলতঃ দুটি বিশেষ দিক ধরা পড়েছে মধুর প্রেম আর নিষিদ্ধ সমাজবিরোধী প্রেম। সেদিক থেকে রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানের বিষয় ভিত্তিক উপন্যাস হিসেবে 'দেনাপাওনা', ছাড়াও 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'পরিনীতা' (১৯১৮), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়। এইসব রচনায় লেখকের ভাবনায় প্রেমের স্বচ্ছতোয়া ধারাটি ছোট ছোট উপল খণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা খুব বেশী নেই। বিষয় সম্পত্তিগত ব্যবধান শরীকী বিরোধ সূত্র, লোকনিন্দার ভয়, অন্তরশায়িনী নিগূঢ়রসংস্কার এগুলি ছিল প্রণয়পথের পরিকল্পিত বাধা। এইসব বাধা সাময়িক, কিন্তু দীর্ঘাস্থায়ী হয়নি। এমনকি দেবদাস উপন্যাসের ক্ষেত্রেও।

শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বড়দিদি' (১৯১৩)। সমাজ নিষিদ্ধ বিধবার প্রেম ও জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী এতে রয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র জমিদার ব্রজলাহিড়ীর কন্যা মাধবী। বিধবা হয়ে পিতার সংসারে ফিরলে তার সঙ্গে আত্মভোলা গৃহশিক্ষক সুরেন্দ্রনাথের সম্পর্কের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে মাধবীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনকে কুমুদিনীর সন্তান সম্ভবনার মধ্যদিয়ে আটকে ছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রও তাঁর 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে বিচ্ছেদ অতিক্রম করতে সন্তানের ভূমিকা প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসে সরয়ূর প্রতি চন্দ্রনাথের প্রেমে কোনো অভাব ছিল না ঠিকই, কিন্তু সরয়ূর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের পর বিরূপ চরিত্রের রাশ টেনে ধরেছে আসন্ন পিতৃত্বের প্রসঙ্গ। এই গল্পের মধ্যে সনাতন আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখ'র উপন্যাসে বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাতের জন্যই প্রতাপ শৈবলিনীর বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল। সেই একই পথে হেঁটে শরৎচন্দ্র তার 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস ও পার্বতীর বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছিলেন শেষপর্যন্ত। উপন্যাসটির উপসংহারে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন— ''এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই

হোক যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে।”[৬৮] এই উপন্যাসেই শরৎচন্দ্র প্রথম বারবণিতার চিত্রাঙ্গন করেছেন। যদিও চন্দ্রমুখী তথাকথিত বারবণিতা হলেও হৃদয়ানুভূতিতে কোনো সামাজিক নারীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই চন্দ্রমুখীর মধ্যদিয়ে লেখক নারী জীবনের মর্মান্তিক সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গোরা’ (১৯১০) উপন্যাসে যেভাবে ব্রাহ্মদের প্রসঙ্গ এনেছিলেন তাঁরই প্রভাবে শরৎচন্দ্র তার ‘পরিণীতা’ (১৯১৪) উপন্যাসে প্রথম ব্রাহ্ম সমাজকে এনেছিলেন—যার পূর্ণরূপ আমরা দেখি ‘দত্তা’ এবং ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির আলোচনায় লিখেছেন— ‘‘পরিণীতা’ গল্পটিতে (১৯১৪) প্রেমের অকুণ্ঠিত মহিমা একটু নূতনভাবে ঘোষিত হইয়াছে। ললিতা শেখরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া সেই সম্পর্ককে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অব্যাহত রাখিয়াছে।”[৬৯] প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় গোপন প্রেম কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে গল্পটি। এই গল্পে যে ব্রাহ্ম প্রসঙ্গ রয়েছে তারই এক ভিন্নতর রূপ দেখি ‘দত্তা’ (১৯১৮) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে ব্রাহ্ম সমাজের কথা শুধু পটভূমিকায় নয় কাহিনীর মধ্যে ঢুকেছে, চরিত্রকেও আশ্রয় করেছে বনমালী, রাসবিহারী এবং জগদীশ —এই তিনবন্ধুর কথা কাহিনীর পটভূমিতে রেখে কাহিনীতে বনমালীর কন্যা বিজয়া, রাসবিহীর পুত্র বিলাস এবং জগদীশের পুত্র নরেনের পারস্পরিক সম্পর্ককেই লেখক বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গেই এসেছে বাংলাদেশের গ্রামসমাজ, ধনতান্ত্রিক ইংরেজী সভ্যতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার তৎকালীন চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে হিন্দু-ব্রাহ্ম সুপ্ত বিরোধের নিরীখে লেখকের ব্রহ্মবিদ্বেষ প্রচ্ছন্ন থাকেনি। অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন— ‘‘...শরৎচন্দ্র সংস্কারবাদী হয়েও হিন্দু সমাজের জাতিত্বের ভিত্তিটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তাই জাতিত্বের অন্ধ সংস্কারের দিকটির প্রতিবাদ করেও এই সামাজিক ব্যবস্থাপনার অন্য মহনীয়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন।”[৭০]

ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে সমাজ যাদের ‘চরিত্রহীন’ বলে সেইসব নরনারীর কথা প্রায়ই বলেছেন। কিন্তু সমকালীন সমাজকে অনেকটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে তিনি এরপর উপন্যাসেরই নামকরণ করেন ‘চরিত্রহীন’ (১৯১৭) এখানে তিনি সমাজকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সমাজ যাদের চরিত্রহীন

হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়, লেখক সেই সমাজকেই পরোক্ষে চরিত্রহীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত প্রসঙ্গত লিখেছেন— ''...সমাজকে তার প্রথাসিদ্ধ নীতিবোধে দাঁড় করিয়ে এভাবে আক্রমণ করা ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। উপন্যাসের মধ্যে তিনি সেভাবে ভর্ৎসনাও করেননি। মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়েই কারবার করেছেন। তবে নামকরণ লেখকের প্রতিবাদকে ধরে রেখেছে।''[৭১] নায়িকা প্রধান এই উপন্যাসে সাবিত্রী এবং কিরণময়ী এই দ্বি-নায়িকার প্রকৃতিকে উল্লেখ করেছেন লেখক। সাবিত্রী কুলত্যাগিনী বিধবা, কিরণময়ী বিদূষী নারী। মেসের ঝি সাবিত্রীকে মহান নারী করে তুলেছেন লেখক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর যে নিম্নস্তরে স্থান তাতে লেখক ব্যথিত ছিলেন। তাই সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী, উপেন্দ্র, দিবাকর, অনঙ্গ ডাক্তার, সুরবালা কেন্দ্রিক এই কাহিনীতে তথাকথিত সমাজ প্রেক্ষাপটে কিরণময়ী আর সাবিত্রীর নারীত্বের মর্যাদাকে প্রতিনিত করেছেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত সতীসাধ্বী নারী সুরবালাকেই লেখক অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ড. অশ্রুকুমার সিকদার প্রসঙ্গত লিখেছেন— ''কিরণময়ী অসামান্য বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবত্তার অধিকারিণী। রুগ্ন স্বামীর সে মৃত্যু কামনা করে। সে আত্মা মানে না, বেদে তার পূর্ণ আস্থা নেই। কিন্তু তার সমাজ বিদ্রোহ স্বামীর মৃত্যুর পরে হয়ে দাঁড়ায় চিরাচরিত বিধবার সমস্যা। কিরণময়ীকে যতোই রক্তিম রক্তিম দীপশিখা করে তুলুন সে নিষ্প্রভ হয়ে যায় মূর্তিমতী সতীত্ব সুরবালার কাছে।''[৭২] রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের ছায়াবহ উপন্যাস 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। এটি লেখকের শেষ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। অতিকঠোর আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে স্বল্পকাল স্থায়ী সংস্রবে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তা বন্দনার চিত্তজগতে যে গুরুতর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তারই ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধটির একজায়গায় লিখেছিলেন— ''...অন্ধের মত নয়; মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়; কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি ক'রে বেড়ালেও নয়। কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।''[৭৩] এই ভাবনারই উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁকে 'পথের দাবী' (১৯২৬) লিখতে হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী মতাদর্শ থেকে স'রে এসে অহিংসপন্থায় পরিবর্তনের ধারাটিকে গুরুত্ব দেখানোর জন্য লেখকের 'পথের দাবী'র পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরাধীন ভারতমাতাকে মুক্তির জন্য রাসবিহারী বসুর মত বিদেশের মাটিতে 'পথের দাবী'র

সংগঠন পরিকল্পনা ছিল রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্রের মনে। আসলে পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। উপন্যাসটি প্রকাশের পর ১৯২৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি ক'রে বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মনোমালিন্যও হয়েছিল। উপন্যাসটির মূল্যায়ন করে ড. সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন— ''পথের দাবী'তে (১৯২৬) বাঙ্গালার বিপ্লব আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে আছড়াইয়া পড়িয়া কিভাবে একটি অস্ফুট প্রেম কাহিনীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহারই চিত্র আঁকা হইয়াছে।"[৭৪] তবে উপন্যাসটিতে অপূর্ব ও ভারতীর প্রেম রহস্যময় গম্ভীর ভীষণ পরিবেশে জমে ওঠেনি। ঘরকুনো বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলেটি না পেরেছে আদর্শ প্রেমিক হতে, না বিপ্লবী। সেই তুলনায় ভারতী অনেক সপ্রতিভ। সব্যসাচী ও সুমিত্রার সম্পর্ক রহস্যঘেরা আন্দোলনের রূপরেখা ব্যর্থ হলে সব্যসাচী আবার বেরিয়ে পড়েছিল নতুন করে সংগঠন করার সংকল্প নিয়ে।

উপন্যাস হিসেবে 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) নিঃসন্দেহে বিতর্কিত। উপন্যাসটির আলোচনায় ড. সুকুমার সেন লিখেছেন— '' বইটি উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। তবে সে উদ্দেশ্য আগেকার উদ্দেশ্য নয়—সাধারণ পাঠক ভোলাইবার জন্য লেখা নয়। তবে ইহাও টেক্কা দিবার জন্য লেখা 'অতি আধুনিক' সাহিত্যিকদের।"[৭৫] উপন্যাসটিতে প্রেম, নারী পুরুষের সম্পর্ক, ধর্ম-সংস্কার, প্রাচীন ভাবাদর্শের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে লেখক প্রশ্ন রেখেছিলেন। কতগুলি আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে এর কাহিনী রচিত হয়েছে। নায়িকা কমল প্রচলিত ধারণা, বিধবা নারীর সতীত্ব —এসবের চাইতে মনুষ্যত্বকেই গুরুত্ব দিয়েছে। কমল একা, তার প্রতিপক্ষ অনেক। তাঁর সম্পর্কে ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন— ''...শেষ প্রশ্নের কমল সবচেয়ে বড় বিদ্রোহিনী। তার জন্মের অসামাজিকতায় তাকে প্রথম থেকেই সমাজের বাইরের মানুষ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সমাজকে তার আঘাত বাইরের দিকের আঘাত বলেই গণ্য হয়। বাইরের আঘাত স্বভাবতই জোরালো হতে পারে না। আর এই বিদ্রোহিনী কমলও শেষ পর্যন্ত হিন্দু বিধবার মতো কৃচ্ছ্রসাধনা করে।"[৭৬] এই কমলকে কেন্দ্র করেই রাজেন ও অজিত চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। শিবনাথের সঙ্গে কমলের এবং মনোরমার সম্পর্ক উপন্যাসের আর একটি বিশেষ দিক। অবিনাশ বাবু, অক্ষয়বাবু, হরেন, নীলিমা সকলেই প্রায় বাদ-প্রতিবাদের উদ্দাম ঝড়ে আবর্তিত। নারী নির্যাতন সম্পর্কে লেখকের কোনো সুস্পষ্ট মতবাদ না থাকলেও

কমল চরিত্রটি যেন সেই প্রতিবাদী সত্তার প্রতিমূর্তি।

শরৎচন্দ্রের আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস হল চার খণ্ডে (১ম পর্ব ১৯১৭, ২য় পর্ব ১৯১৮, ৩য় পর্ব ১৯২৭ এবং ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩) বিভক্ত 'শ্রীকান্ত'। এটি লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ভবঘুরে জীবন অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ ফসল এটি। যদিও উপন্যাসটির আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— ''...ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কিনা, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়। উপন্যাসের নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। কিন্তু ইহার গ্রন্থন সূত্রটা যতই শিথিল হউক না কেন, গ্রথিত পরিচ্ছেদগুলি এক-একটি মহামূল্য রত্ন।''[৭৭]

উপন্যাসটির প্রথম পর্বে রয়েছে শ্রীকান্তের জীবনের সমান্তরালে ইতিহাসের নানা মর্মস্পর্শী কাহিনী। লেখকের বাল্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা সূত্রেই এসেছে ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, নিবুদিদি, রাজলক্ষ্মী, মেজদা প্রভৃতি চরিত্রের কথা। ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির সঙ্গে বাস্তবের মানুষের মিল থাকলেও চরিত্রটির ভূমিকার আয়োজন নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর মতো বোহেমিয়ান মনে হয়। দ্বিতীয় পর্বটি ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় লেখা মূলতঃ অভয়া কেন্দ্রিক কাহিনী। এখানে সমুদ্রযাত্রা বর্ণনা, জীবন সমালোচনা আর সূর্য পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ব্রহ্মদেশের নারী স্বাধীনতা, অভয়ার স্বামীর পত্নী বাৎসল্য, কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক স্বামী কর্তৃক ব্রহ্মস্ত্রীকে পরিত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাকে তুলে ধরেছেন লেখক। তৃতীয় পর্বটিতে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী একটা স্থির লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। এই অংশের বিশিষ্ট চরিত্র বজ্রানন্দ—তিনি যেন দেশপ্রীতির নিবিড় বেদনাবোধের প্রতিমূর্তি। আর শেষ পর্বটিতে নারীর জীবন সমস্যাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই অংশে কমললতার ট্রাজেডি সবচেয়ে বেশী হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই নারী জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনাতেই লিখেছেন—''মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না, তাহা দুস্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটা নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন এটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধকরি এক ফোটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটিই খুলিয়া দিতে ইতস্তত করেন না। তেমনি ঈশ্বর না করুন যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, যে তর্কের

চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।"[৭৮] এখানেই রাজলক্ষ্মীর কাহিনী পূর্ণতা পেয়েছে। আসলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের জীবনের মূল্য জলের মতই। কেননা তাদের অভাব বোধ করে না সমাজ। তাই মেয়েদের আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্যপথ খোলা থাকে না। কিংবা আত্মসম্মান নিয়ে সমাজ বৃত্তের বাইরে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয়। তাইতো কমললতাকে দেখা যায় অর্থের জন্য বৃন্দাবনের দিকে ফিরে গেছে আর রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটি পোড়া মাটিতে জমিদারী কিনেছে। এককথায় নারীর দুর্গতির আর প্রতিকারহীন লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করেই লেখক কাহিনীতে ইতি টেনেছেন। কাহিনীটিতে ধারা বাহিকতা থাকলেও উপন্যাসের সংহত ও অখণ্ড রূপ এতে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার বিবর্তনের ধারায় শরৎচন্দ্রই নির্ণায়ক হবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আর -এর প্রতি-মূল্যায়নে ড. অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থই লিখেছেন— "...তিনি (শরৎচন্দ্র) গতিনিয়ামক হয়েছেন একথা দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহাসিক সত্য। আবার এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁরাই বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তাঁরা শরৎচন্দ্রের প্রভাব মুক্ত হয়েছিলেন বলেই তা করতে পেরেছেন।"[৭৯]

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) — ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ।

২. Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, J. A. Cuddon, Penguin Reference Fourth edition 1998, England, p. 160.

৩. A Glossary of Literary Terms : M. H. Abrams Thomson, Seventh Edition, p. 190.

৪. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯।

৫. সাহিত্য সন্দর্শন, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৯১।

৬. সূচনা, চোখের বালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮৬, পৃ. ৩৭৩।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৮. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র ঃ ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৭।

৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত, ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, শিলালিপি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৯।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

১১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৬।

১২. বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড), বঙ্কিম রচনাবলীর, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

১৭. ভূমিকা অংশ, বঙ্কিমরচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৮০।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১৯. প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড), বঙ্কিম রচনাবলী, তুলিকলম, কলকাতা, পৃ. ১৮৮।

২০. বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দুই স্থপতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৯।

২১. সাহিত্য, বিশ্বভারতী, গ্রন্থন বিভাগ, পুনর্মদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৬১।

২২. বঙ্কিম রচনাবলী, তুলিকলম, পৃ. ৬২১-২২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-৫৮।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

২৬. সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০১।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

২৮. সুলভ শরৎসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২১৬০।

২৯. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১২৮।

৩০. বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, ২০০৩, পৃ. ১১৮।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬০।

৩২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯২।

৩৩. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ শিল্প রীতি, গ্রন্থনিলয়, ১৯৯৬, পৃ. ২৩৯।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৩৫. বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৫৫।

৩৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।

৩৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯০৩, পৃ. ৬০৩।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩।

৪০. রবীন্দ্র উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৩৪।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ। ৭০১।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৪৩. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৪৪. গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ. ৪৫৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৪৬. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

৪৮. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ২০০০, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৫০. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৬।

৫১. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ১২।

৫২. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৪।

৫৩. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১০ পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ৪৪৭।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

৫৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৫৬. প্রাগুক্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, ২০০১, পৃ. ৪১৫।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২৩।

৫৮. শরৎ সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ২৯।

৫৯. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪০।

৬০. আধুনিক ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, পৃ. ৪৭।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৬৩. শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা, ২০০০, সপ্তদশ সংস্করণ।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৬৫. শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, ১৯৮৮, পৃ. ৯।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

৬৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪২।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৭৩. শরৎ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫৪।

৭৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২৮।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২৯।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।